পশ্চিমবঙ্গ

নভেম্বর, ২০১৮-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

জাগ্রত যে বাংলা

২৩ জানুয়ারি, ২০১৮। দার্জিলিঙে মুখ্যমন্ত্রী নেতাজির জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানে।

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র
বর্ষ-৫১ সংখ্যা ৭–১০
নভেম্বর ২০১৮-ফেব্রুয়ারি ২০১৯

মূল্য : ৩০ টাকা

সূ • চি • প • ত্র

সম্পাদকীয় ৩
বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ২০১৯ ৪
বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের খুঁটিনাটি ৭
কৃষক বন্ধু সম্মেলনের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৯

দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেলেন 'স্কচ' পুরস্কার ১০

সবুজ সাথী, উৎকর্ষ বাংলা ও খাদ্যসাথী প্রকল্প আন্তর্জাতিক পুরস্কারের দাবিদার ১২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ১৪

উত্তরবঙ্গ উৎসব ১৮

নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন ২০

তারাপীঠ ও রামপুরহাটে মুখ্যমন্ত্রী ২২

বিশ্ব বাংলা গেটের উদ্‌বোধন ২৩

রানি রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটির উদ্‌বোধন ২৪

'খেলাশ্রী' সম্মান প্রদান ২৬

সংবাদ ৩০

উপদেষ্টা সম্পাদক
প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক
আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
সুপ্রিয়া রায়

সহ-সম্পাদক
রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য

প্রথম প্রচ্ছদ পরিচিতি
বীরভূমে বাউল উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী
ছবি : অশোক মজুমদার

প্রচ্ছদ অলংকরণ- **সুরজিৎ পাল**

সম্পাদকীয় শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com
বিতরণ শাখা: ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) **১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত**

ফটোফিচার

- বাংলার পর্যটন বিস্ময় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের গজলডোবা ৪২
- উন্নয়নের গঙ্গাসাগর ৫৬
- বাবুঘাটে সাধু সমাগম ৬০

প্রয়াণ: মুখ্যমন্ত্রীর শোকজ্ঞাপন ৬২

মুখ্যমন্ত্রীর সফরনামা

লক্ষ্য শিল্পায়ন: মুখ্যমন্ত্রীর জার্মানি ও ইতালি সফর ৬৪

মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর ৬৮

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

চলচ্চিত্র উৎসবের বর্ণময় উদ্‌বোধন ৭৪

পর্দার আড়ালে যাঁরা... ৮০

শতবর্ষে বাংলার চলচ্চিত্র ৮২

শতবর্ষ স্মরণে অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্র ৮৮

সত্যজিৎ-স্মরণে নন্দিতা ৯২

সিনেমার আড্ডা, আড্ডায় সিনেমা ৯৪

এক ঝলকে ৯৮

সমাপ্তিতে বর্ণময় আগামীর অঙ্গীকার ১০০

সঙ্গীত মেলা ও বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব ১০৪

আগামী বছর থেকে বাংলার গ্রামে গ্রামে সঙ্গীতমেলা : মুখ্যমন্ত্রী

সাংবাদিকদের পেনশন চালু করে মুখ্যমন্ত্রী বোঝালেন ১০৮
তিনি সমাজের সর্বস্তরের জন্যই ভাবেন : দেবাশিস ভট্টাচার্য

কৃষক বন্ধু ১১০

বঙ্গ দর্শন

ক্রোড়পত্র: **জাগ্রত যে বাংলা** ১১৪

পরাধীন ভারতবর্ষে এই বাংলার ভূমি থেকেই জাগরণের নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিল বিশ্ব। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, আধ্যাত্মিকতায় বাংলার কৃতি সন্তানেরা বিশ্বজয় করেছিলেন। ১২৫ বছর আগে শিকাগোর বিশ্বধর্ম সভায় ভারতবর্ষকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিবেকানন্দ। সেই গৌরবের ধারাকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা মার্গারেট। স্বামীজি যাঁকে ভারতের উন্নয়নে নিবেদন করে নাম দিয়েছিলেন 'নিবেদিতা'। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই উত্তরসূরীর হাত ধরে এগিয়ে চলেছিল বাংলা তথা ভারত। বিভিন্ন লেখায় ও চিঠির পুনর্মুদ্রণে নিবেদিতার জীবন ও কর্মসাধনাকে নতুন করে তুলে ধরা হল এই ক্রোড়পত্রে।

- মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াকের সূচনা ১১৮
- যত মত তত পথ ১২২
- মাদ্রাজ মহাজন সভায় নিবেদিতার বক্তৃতায় জগদীশ বসুর কথা ১৪৮
- জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার চিঠি ১৫১
- মার্গারেট থেকে নিবেদিতা ১৫৫
- নিবেদিতা সম্পর্কে লেডি অবলা বসু ১৬২
- নিবেদিতা সম্পর্কে ভাই রিচমন্ডের স্মৃতিচারণ ১৬৬
- নিবেদিতা সম্পর্কে ভাই রিচমন্ডের লেখা ১৬৮

স • ম্পা • দ • কী • য়

সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বাংলা

সুস্থ জীবনের প্রথম কাম্যবস্তু—শান্তি।

শান্তি বজায় রাখার অঙ্গীকারে বাংলার সকলে সামিল হয়েছেন। সরকারও বদ্ধপরিকর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে।

সর্বধর্ম-সমন্বয়ের যে জীবনচর্যা বাংলাকে আদিযুগ থেকে বিশিষ্টতা দিয়েছে, সেই ধারাই বাংলার উন্নয়নের মূল উৎস।

সাম্প্রতিক উন্নয়নের চালচিত্রজুড়ে মানবধর্মের উজ্জ্বল প্রকাশ উচ্ছ্বসিত উৎসবের আঙিনায়। উৎসব ও মেলার গুরুত্ব এই বিশ্বায়নের যুগেও অপরিসীম। মানসিক বিকাশ ও উন্নয়নে মস্ত ভূমিকা পালন করছে উৎসব। বাংলার উৎসব মানবধর্মের শিকড় ক্রমশ গভীরে প্রোথিত করছে। উৎসবের মূল কথা—আনন্দে বাঁচো। এই বিশ্বজগৎ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। স্রষ্টার আনন্দবাণীকে জগৎজুড়ে ছড়িয়ে দিতে বাংলার মানুষ চিরকাল পা বাড়িয়েছে। আজও এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না।

মানবসংস্কৃতির বহুমূল্যবান ধনরত্নের সম্ভার বাংলার ভাণ্ডারকে চির-গৌরবান্বিত করে রেখেছে। এই গৌরব আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারি উদ্যোগে।

উন্নয়নের এই নবপর্যায়ে বাংলার নবজাগরণের ধারায় সংস্কৃতির মেলবন্ধনের প্রবাহকে গতিমুখর করে তুলেছে। রাজ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের সুস্থিত পরিবেশে, উন্নয়ন পাচ্ছে অন্য মাত্রা।

এই সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ-সহ একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হল।

যে কোনও ত্রুটির জন্য মার্জনা চাইছি।

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ২০১৯

০৬/০২/২০১৯

বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট ২০১৯-র আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোমুখি একান্ত বৈঠকে বসেন ইতালির লোমবার্ডি প্রাদেশিক সরকারের উপরাষ্ট্রপতি ফ্রাবিজিও সালা, জাপানের রাষ্ট্রদূত কেনজি হিরামৎসু এবং জার্মানীর নর্থ রাইন ওয়েস্ট ফালিয়ার অর্থ-উদ্ভাবনী-ডিজিটাইজেশন-বিদ্যুৎ মন্ত্রকের মন্ত্রী অন্দ্রেইয়াস পিংকওয়ার্থ-এর সঙ্গে।খ এই বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান যে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের নতুন ভাবনা আলোচনায় উঠে এসেছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দেশ-বিদেশের বহু শিল্প উদ্যোগ-ও সামিটে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা চক্রে মিলিত হন।

০৭/০২/২০১৯

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে শুরু হল বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট ২০১৯। এবারের সামিটে মোট ৩৫টি দেশের প্রতিনিধিরা এসেছেন। এর মধ্যে ১২টি সহযোগী দেশের অগ্রণী শিল্প উদ্যোগী ও রাষ্ট্রদূত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছেন এবারের বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলনে। বিদেশী প্রতিনিধিরা তাঁদের ভাষণে বিবৃত করেন যে কীভাবে বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত হয়েছে। বাংলা সম্পর্কে ধারণা বদল হয়েছে বিশ্বের শিল্প উদ্যোগীদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাজ্যের সঙ্গে ইতালি, জার্মানী ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের মউ (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশ ও অন্যান্য রাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামিট চলাকালীন মউ (MOU) ও মোয়া (MOA) স্বাক্ষরিত হয় দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, আর্থিক সহযোগিতা, সামাজিক ক্ষেত্রে যৌথ পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে সামিটে বিশদে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, দেশ আজ আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে। এক নতুন স্বপ্নের সূচনা আগামী দিনে হতে চলেছে। দেশে এক নতুন শিল্প বাণিজ্য নীতি আরোপিত হবে, এর ফলে সমগ্র দেশ উপকৃত হবে। দেশের তরুণ প্রজন্ম আগামী দিনে সুখী সমৃদ্ধ এক দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচিত হবে।

০৮/০২/২০১৯

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে, বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ২০১৯ এর সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি জানান যে, এই সম্মেলনে এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৮৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং আরও প্রস্তাব আসছে। এবারের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ৮৬টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আনুমানিক ৪৫টি বিটুজি এবং ১২০০টি বিটুবি বৈঠক হয়েছে, জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই সম্মেলনে আসা সকল দেশ, সেই দেশের নাগরিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি, সারা দেশ ও বিদেশের শিল্পপতি এবং সবাইকে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ২০১৯ সফল করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সন্ধ্যায় মা উড়ালপুলের পশ্চিম দিকে যাবার নবনির্মিত র‍্যাম্পের উদ্‌বোধন করেন।

২০১৯-এর বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের খুঁটিনাটি

২০১৮: শিল্প সম্মেলন

আগত ৩৫টি দেশের প্রতিনিধি

রাজ্যের পরিকাঠামো শিল্পে রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগের দৃষ্টান্তকেই শিল্পপতিদের সম্মেলনে গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকা পরিকাঠামো খাতে—রাস্তা, সেতু নির্মাণ-সহ স্থায়ী সম্পদ গড়ায় খরচ করছে রাজ্য। কলকাতা ছাড়াও জেলা, শহর ও পঞ্চায়েত এলাকায় যেভাবে একের পর এক সেতু, নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা অন্য কোনো রাজ্যে হয়নি। শিল্পস্থাপনে পরিকাঠামোর গুরুত্ব বুঝেই একটি আর্থিক বছরে এত টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। এটি শিল্পোদ্যোগীদের কাছেও সদর্থক বার্তা।

অন্যদিকে, ভেনেজুয়েলা, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, পেরু, ব্রাজিল-সহ মোট বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রদূতকে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একটি বণিকসভার উপস্থিতিতে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে বাংলার সম্পর্কের উন্নয়ন নিয়ে আশা প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। বাংলা একক প্রচেষ্টায় শিল্পায়নে শীর্ষে পৌঁছেছে। শিল্পপতিদের মন্ত্রী তখনই বলেছিলেন, বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসুন। গতবছর ৫০০ জন বিদেশি বাণিজ্যিক অতিথি এসেছিলেন সম্মেলনে। এই বছর জার্মানির ডুসেলডর্ফ থেকে মন্ত্রী-সহ ৫০জন বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধি দল আসছেন। কোরিয়ার গভর্নর আসছেন। ইতালি থেকে বিশেষ প্রতিনিধিদল আসছে। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে আমি আপনাদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হয়ে গেল ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ এবং ৮ তারিখ রাজারহাটের কনভেনশন সেন্টারে। দেশ-বিদেশের শিল্পপতিদের নিয়ে এই সম্মেলন হয় শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি জার্মানি-ইতালি সফরে গিয়েছিলেন। ওই দুই দেশ থেকে একদল শিল্পপতি এই বাণিজ্য সম্মেলনে হাজির ছিলেন। এছাড়াও ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ থেকে বহু প্রতিনিধি আসেন।

গত ২৭ আগস্ট বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন, ২০১৯-এর জন্য প্রস্তুতি সভা আয়োজিত হয়। নবান্ন সভাঘরে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বাণিজ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন, ২০১৯-এর জন্য দেশে-বিদেশে কোথায় কোথায় রোড শো করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। ২০১৫ সালে এই সম্মেলন শুরু হয় এবং ২০১৭ পর্যন্ত এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত মিলন মেলা প্রাঙ্গণে। ২০১৮ সালে প্রথমবার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। ২০১৯ সালেও সেখানেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বহু দেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি আসেন এখানে। ২০১৮ সালের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩২টি দেশের প্রতিনিধি। জাপান, জার্মানি, ইটালি, পোল্যান্ড, রিপাবলিক অফ কোরিয়া, ফ্রান্স, চেক রিপাবলিক, ইউনাইটেড কিংডম, আরব সকলেই অংশীদার দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিল। ইউরোপ, আমেরিকা মহাদেশ এবং এশিয়ার অন্য অনেক দেশও ২০১৮ সালের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল।

২০১৭: শিল্প সম্মেলন

কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

২০১৮-র ৩১ ডিসেম্বর কৃষকদের স্বার্থে কৃষকবন্ধু প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার এক মাসের মাথায় কয়েকজন কৃষকের হাতে চেক তুলে দিয়ে এই প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে কৃষি দপ্তরকে ৪,১৫০ কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে অর্থ দপ্তর। তার মধ্যে চার হাজার কোটি টাকা চাষের জন্য কৃষকদের সাহায্য করতে দেওয়া হচ্ছে। বাকি ১৫০ কোটি টাকায় কোনও কৃষক মারা গেলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের কৃষকবন্ধু ডেথ বেনিফিট স্কিম থেকে দু'লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে।

অর্থ দপ্তর থেকে রাজ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা চলে গেছে। সেখান থেকে চেকের মাধ্যমে কৃষকরা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে টাকা পাবেন। এই প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে ২৮ জানুয়ারি রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকে শিবির চালু হয়েছে। শিবিরগুলি থেকে নাম নথিভুক্ত করছেন কৃষকরা। ইতিমধ্যেই ১৭ হাজার কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, কৃষক বন্ধু প্রকল্প চালু হল। উপকৃতরা পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে টাকা পাবেন। ১৮-৬০ বছরের মধ্যে যদি কোনও কৃষক মারা যায় তাহলে সরকার তাদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেবে। কৃষকদের শস্য বিমার টাকা দিতে হয় না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলে গেলাম ৮০% টাকা রাজ্য সরকার দেয়। আগামী দিনে পুরো টাকাটাই রাজ্য সরকার দেবে। কৃষিজমির খাজনা মকুব করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। কৃষিজমির মিউটেশনও মকুব করে দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের পেনশনের টাকা ৭৫০ থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে। ৬৫,০০০ কৃষকের বদলে এখন ১ লক্ষ কৃষক এই পেনশন পান। বাংলায় কৃষকদের আয় তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে।

ব্লাড ব্যাঙ্কের অ্যাপ – জীবন শক্তির উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অ্যাপের উদ্‌বোধন করলেন। এই 'জীবন শক্তি' অ্যাপে পাওয়া যাবে সারা বাংলার ৮৪টি ব্লাড ব্যাঙ্কে থাকা রক্তের সন্ধান। নাগরিক কেন্দ্রিক অ্যাপটি তৈরি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর।

এই অ্যাপে ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং রক্তের গ্রুপের এলাকাভিত্তিক সন্ধান করা যাবে। প্রতি ব্লাড ব্যাঙ্কে কোন কোন গ্রুপের কত রক্ত সঞ্চিত আছে, তাও জানতে পারা যাবে এই অ্যাপে। এই অ্যাপের মূল বৈশিষ্ট্য রাজ্যের রক্তদাতাদের নাম, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা এবং ব্লাড গ্রুপ নথিভুক্ত থাকবে। ইচ্ছুক রক্তদাতারা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ২০১১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে রাজ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ব্লাড ব্যাঙ্কের সংখ্যা। আগে রাজ্যে ছিল মাত্র ৫৫টি ব্লাড ব্যাঙ্ক। এখন সেই সংখ্যাটি হল ৭৬। এছাড়া ১৭টি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিটও তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, খুব শীঘ্রই, ১২টি নতুন ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং ২১টি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিটও তৈরি হবে।

সরকারের উদ্যোগে কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে পূর্ব ভারতের প্রথম সরকারি কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে।

কর্মাঞ্জলির উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কর্মরতা মহিলাদের জন্য স্বল্প ভাড়ার হস্টেল কর্মাঞ্জলির উদ্‌বোধন করলেন। প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি হস্টেল উদ্‌বোধন করা হল। এই হস্টেলগুলি আছে কলকাতার রিজেন্ট পার্ক, বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, এইচ কে শেঠ লেন, বনমালী নস্কর রোড এবং সি এন রায় রোডে।

রিজেন্ট পার্কের কর্মাঞ্জলিতে ৩৪টি কক্ষ থাকছে, বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের হস্টেলেও থাকছে ৩৪টি কক্ষ, এইচ কে শেঠ লেনের হস্টেলে থাকছে ৭৬টি কক্ষ, বনমালী নস্কর রোডের কর্মাঞ্জলিতে থাকছে ৬১টি কক্ষ এবং সি এন রায় রোডের হস্টেলে থাকছে ৯৬টি কক্ষ। এই হস্টেলগুলিতে প্রতি আবাসিক পাবেন স্নানঘর, বারান্দা, রান্নার জায়গা এবং একক শয়ন কক্ষ। এছাড়া থাকছে ২৪ ঘণ্টা জলের ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বিশদে জানতে যোগাযোগ করতে হবে WWW.WBHOUSING.GOV.IN ওয়েবসাইটে।

দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পেলেন 'স্কচ' পুরস্কার

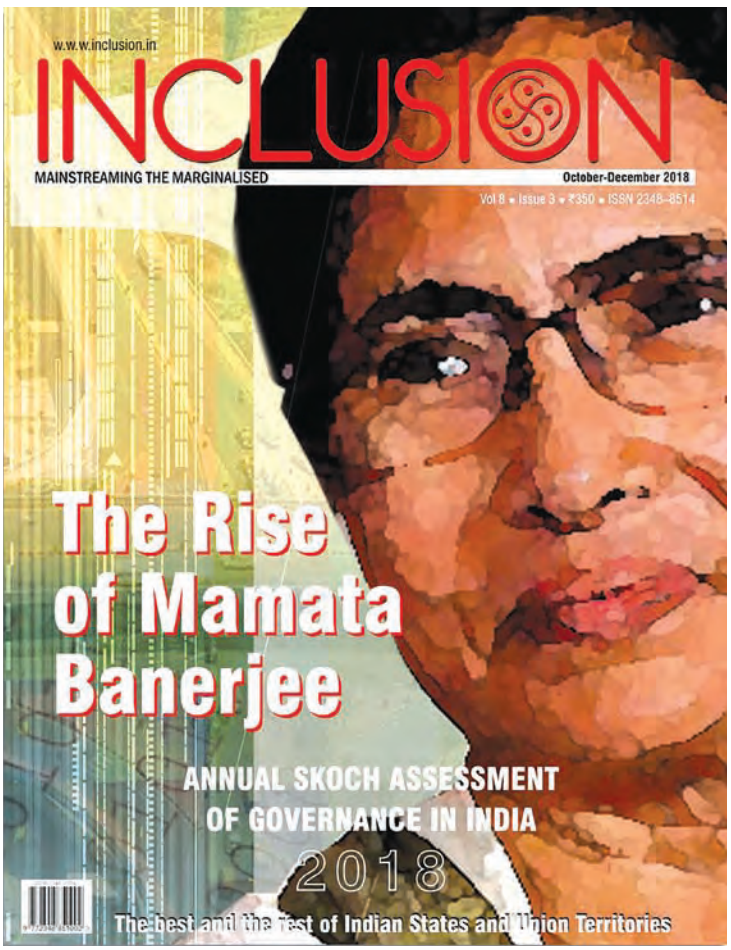

গ্রামোন্নয়ন, মাঝারি শিল্প-সহ একগুচ্ছ সরকারি পরিষেবায় অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি ও উদ্ভাবনীর জন্যে আন্তর্জাতিক 'স্কচ অ্যাওয়ার্ড' পেলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেও গোটা দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জনসেবামূলক প্রকল্পের জন্য দেশের অন্যান্য রাজ্যকে টেক্কা দিয়ে বাংলার একাধিক সরকারি প্রকল্প এই সম্মানজনক আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নিয়েছে। ২০১৮ সালের স্কচ অ্যাওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে প্রশাসনিক ও জনপরিষেবামূলক প্রকল্প রূপায়ণে 'ভারতের সেরা মুখ্যমন্ত্রী' শিরোপা উঠেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যের মুকুটে। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই দেশে নারীশক্তির অন্যতম প্রধান মুখও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। এর আগে বাংলার পথদিশা ও গতিধারা প্রকল্পও দেশের মধ্যে স্কচ অ্যাওয়ার্ড জিতেছিল।

২০১৮ সালের স্কচ পুরস্কারের জন্যে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা সমস্ত দিক বিচার করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'স্কচ চিফ মিনিস্টার অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত করেছেন। মূলত, সরকারে থেকে সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ করার সদিচ্ছা এবং সুপ্রশাসক হিসেবে কোন মুখ্যমন্ত্রী কতটা সফল এবং নিজেদের রাজ্যে প্রশাসনিক সংস্কারমূলক কাজ কতখানি বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন, তার ওপরেই সেরার তালিকা তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে, কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা ২০১৬ সালে যেখানে ১৪ নম্বরে ছিল, মাত্র দু-বছরের মধ্যে এক নম্বরে চলে এসেছে।

দেশের সেরা রাজ্য বাংলা। সেরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোবাধ্যায়। সাধারণ মানুষের কাছে এই স্বীকৃতি মিলেছে আগেই। এবার স্কচ গ্রুপ দিল সেই স্বীকৃতি। বাংলাকে ভারতসেরার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেরা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেই। বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনেছেন কন্যাশ্রী। তিনি এনেছেন রূপশ্রী। তাঁর নেতৃত্বে চলছে শিল্পশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজসাথী, গতিধারা, স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প, সমব্যাথী, মুক্তির আলো, সবলা, আলোশ্রী ইত্যাদি প্রকল্প। খাদ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় তিনি মানুষের ঘরে ঘরে দু'টাকার চাল বিনামূল্যে পৌঁছে দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সরকারি হাসপাতালগুলিতে বিনা খরচায় চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আর ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট লাঘব করতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সবুজসাথী প্রকল্পের সাইকেল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যেভাবে প্রতিটি প্রান্তের মানুষ কোনও না কোনওভাবে উপকৃত হচ্ছেন বা সুবিধা পাচ্ছেন তার নজির সারা দেশেই নেই। বিশ্বের দরবারে প্রতিবারই স্বীকৃতি পাচ্ছে সেই প্রকল্পগুলি। সারা বিশ্ব মেনে নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পের অভিনবত্ব। বাংলাকে আবার ভারতসেরা করাই তাঁর লক্ষ্য, তাঁর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন তিনি সফল করে তুলেছেন। আগেও স্কচ গ্রুপ রাজ্যের প্রকল্পকে সেরার তালিকায়

স্থান দিয়েছে। এই সংস্থার রিপোর্ট ও সম্মানকে মেনে নেয় অন্য রাজ্য। দেশে এই তালিকাকেই ইদানীং একমাত্র বিবেচ্য হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। সব রাজ্যই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এবার 'স্কচ স্টেট অফ গভর্ন্যান্স' রিপোর্টে সমীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে সব রাজ্যের তালিকায় প্রথম নাম বাংলার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কেন্দ্রশাসিত-সহ বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে নানা মাপকাঠিতে তালিকা তৈরি করে স্কচ গ্রুপ। তাদের মূল্যায়ন রিপোর্টে থেকে যায় বিশ্লেষণ। স্কচ ফাউন্ডেশন আবার নানা দপ্তরের কাজের নিরিখে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়ের তালিকা তৈরি করে। রিপোর্টে সেরা বাংলা। দ্বিতীয় স্থানে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু ও তেলেঙ্গানার কে চন্দ্রশেখর রাও। এরপর ছত্তিশগড় ও পঞ্জাব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যের বিষয়টিকে নজরকাড়া হিসাবে চিহ্নিত করেছে স্কচ। স্কচ রিপোর্টে তাঁর সাফল্যকে বারবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সব ধরনের বাধা সত্ত্বেও যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা এক নম্বর স্থানে রয়েছে, তা অন্য দলগুলি বা মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবজ্ঞা করা যেতে পারে না। স্কচ গ্রুপ ১৯৯৭ সাল থেকে রাজ্যগুলির পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দেয়। প্রতিটি রাজ্যের দক্ষতার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সমীক্ষার পরই সেরার তকমা দেওয়া হয়। বার্ষিক রিপোর্ট বের করা হয়, 'স্কচ স্টেট অফ গভর্নন্যান্স রিপোর্টে'। ২০১৮ সালের অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে বেশ কিছু ক্ষেত্রে মূলত কোনও রাজ্যের সরকারের উত্থান ও পতনে জোর দেওয়া হয়েছে। গত বছরের সারিতে হরিয়ানা ছিল চতুর্থ স্থানে। মহারাষ্ট্রও তৃতীয় স্থান থেকে নেমে গিয়েছে অষ্টম স্থানে। আগে উত্তর প্রদেশ ছিল অষ্টম স্থানে। এই সেই পর্যায় দাঁড়িয়েছে দ্বাদশ।

‘সবুজ সাথী’ প্রকল্পকে ‘চ্যাম্পিয়ন প্রোজেক্ট’ ঘোষণা রাষ্ট্রসংঘ-এর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় চালু হওয়া প্রকল্প ‘সবুজ সাথী’ এখন বিশ্ববন্দিত। রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা আইটিইউ আয়োজিত ডব্লিউএসআইএস পুরস্কারে বাংলার এই প্রকল্পকে ‘চ্যাম্পিয়ন প্রোজেক্ট’ ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার পরিচালিত সমস্ত স্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে মোট ৭০ লক্ষ সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে এবং আগামী শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই এই সংখ্যা ১ কোটি ছুঁয়ে যাবে। ‘ই-গভর্ন্যান্স’ বিভাগে ১১৪০টি প্রকল্পের মধ্যে থেকে সেরা পাঁচটিতে বাংলার এই প্রকল্প জায়গা করে নেয়। ২০ লক্ষেরও বেশি ভোট জমা পড়ে। ৯ই এপ্রিল জেনেভায় আইটিইউ-এর সদর দপ্তরে একটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে।

রাষ্ট্রসংঘের পুরস্কারের দাবিদার ‘উৎকর্ষ বাংলা’

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় চালু হওয়া দক্ষতা উন্নয়নের প্রকল্প ‘উৎকর্ষ বাংলা’ এখন বিশ্ব বন্দিত। রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা আইটিইউ আয়োজিত ডব্লিউএসআইএস পুরস্কারে বাংলার এই প্রকল্পকে ‘চ্যাম্পিয়ন প্রোজেক্ট’ ঘোষণা করা হয়েছে।

১৮টি বিষয়ে বিশ্বজুড়ে ১০৬২ মনোনয়ন জমা পড়ে। ২০ লক্ষেরও বেশি ভোট জমা পড়ে। ‘ক্যাপাসিটি বিল্ডিং’ বিভাগে ১৪৩টি প্রকল্পের মধ্যে থেকে সেরা পাঁচটিতে বাংলার এই প্রকল্প। ৯ই এপ্রিল জেনেভায় আইটিইউ-এর সদর দপ্তরে একটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে।

‘খাদ্য সাথী’ প্রকল্পকে স্কচ অ্যাওয়ার্ড

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘খাদ্য সাথী’ প্রকল্প এবার জাতীয় স্তরে সম্মান পেল। দিল্লিতে ‘সকলের জন্য খাদ্য’ সরবরাহ করার জন্য বাংলাকে স্কচ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। জাতীয় স্তরে এই সম্মানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কনস্টিটিউশন ক্লাবে ওই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়।

প্রসঙ্গত, খাদ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় সাড়ে আট কোটি মানুষের কাছে খাদ্য সাথী প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া চা-বাগানে বসবাসকারী সব পরিবার ২ টাকা কেজি দরে প্রতি মাসে ৩৫ কেজি রেশন পাচ্ছেন। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং জঙ্গলমহলের উপভোক্তারা বর্ধিত খাদ্য পাচ্ছেন। টোটো জনজাতিদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে।

বাংলার মুকুটে নতুন পালক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

‘আমার ভাষা কাউকে ঘৃণা করতে শেখায়নি’

—মুখ্যমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা শহিদ স্তম্ভে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, এই দিনটি আমাদের কাছে খুব পুণ্য দিন, পবিত্র দিন, স্মরণীয় দিন, বরণীয় দিন। ভাষা আন্দোলনের শহিদরা যাঁরা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের যেমন শ্রদ্ধা জানাই, তেমনই সারা পৃথিবী জুড়ে কোথাও না কোথাও কখনও না কখনও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার জন্য অনেকে অনেক আন্দোলন সংগঠিত করে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের বলিদান বৃথা যায় না। সেই বলিদানকেও আমরা সম্মান জানাচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৯ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রসংঘ মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রে বাংলার একটা অবদান আছে। ভাষার দিকে থেকে বাংলা বিশ্বে পঞ্চম বৃহত্তম এবং এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। বাংলা ভাষা আমার প্রাণ। তেমনই আমরা সব ভাষাকে ভালোবাসি।

মাতৃভাষা আমাদের শিখিয়েছে বিদ্বেষ ছড়াবে না, কুৎসা ছড়াবে না, অপপ্রচার ছড়াবে না, মানুষকে ভালবাসতে, মানুষকে আপন করতে। এটাই আমাদের মানবধর্মের সব থেকে বড়

কথা। আমরা চাই ভারতবর্ষ এক থাকুক, ভারতবর্ষ মাথা তুলে দাঁড়াক, ভারতবর্ষ কখনও উগ্রপন্থার দেশ হতে পারে না, ভারতবর্ষ কখনও রুদ্ধপন্থার দেশ হতে পারে না, ভারতবর্ষ কখনও অর্ধশিক্ষার দেশ হতে পারে না। ভারতবর্ষ রৌদ্রদীপ্ত তেজস্বিকতার জন্য চিরকাল বিখ্যাত।

তিনি আরও বলেন, সব ভাষাকে ভালোবাসব। সব ধর্মকে ভালবাসব। সব সংস্কৃতিকে ভালবাসব। সব মানুষকে ভালবাসব। কোনও ভেদাভেদের রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। কোনও ভেদাভেদের সংস্কৃতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। কোনও ভেদাভেদের সংকীর্ণ মানসিকতাকে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, বিন্ধ্য পর্বত থেকে দ্বারকা, ত্রিপুরা থেকে বাংলা, উত্তরপ্রদেশ থেকে অসম, সর্বত্র সব মানুষ ভালো থাক। আমি মাতৃভাষাতেই বলব যে আমার ভাষা কাউকে ঘৃণা করতে শেখায়নি। বাংলাকে জানতে হলে বাংলার মাটিকে চিনতে হবে। বাংলার সংস্কৃতিকে জানতে হবে আর তা জানতে হলে ভারতের সভ্যতাকে জানতে হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী তিনটি পুস্তক উদ্‌বোধন করেন, যার একটি স্বরচিত। নাম 'জাগরণের বাংলা'। অপরটি কার্টুনে বাংলার নানা প্রকল্প এবং তৃতীয়টি শতবর্ষে বাংলার চলচ্চিত্র বিষয়ক।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা-সংস্কৃতি না বাঁচলে দেশের ইতিহাস বাঁচবে না। রুখে দাঁড়ান। অনেক মানুষ দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন, দেশকে ভালবেসে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা কখনও এই দেশের সাথে, এই ভাষার সাথে, এই দেশের ঐক্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

তিনি আরও বলেন যে, আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ ভারত। আসুন আমরা একসাথে ভাবি, ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলি। এই বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলি।

উত্তরবঙ্গ উৎসব

দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আমার দুই ভাই-বোন: মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বার্ষিক উত্তরবঙ্গ উৎসবের উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি বছর উত্তরবঙ্গ উৎসব উদযাপন করা হয়। এই উৎসবে আট জেলার স্থানীয় শিল্পী ও লোকশিল্পীদের শিল্প তুলে ধরা হয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষমতায় আসার পর ২০১২ সাল থেকেই আমরা উত্তরবঙ্গ উৎসব পালন করি। এই আট জেলার সম্মানীয় ব্যক্তিদের, মাটির মানুষদের এক জন করে আমরা বঙ্গরত্ন পুরস্কার দিই। আমি ২-৩ মাস অন্তর এখানে আসি, প্রশাসনিক বৈঠক করি, যা আগে ছিল না।

উত্তরকন্যা সচিবালয় তৈরি হয়েছে, কয়েকদিন আগে ভোরের আলো উদ্‌বোধন হয়েছে। নতুন ফ্লাইওভার হয়ে গেলে ৪৫ মিনিটে বাগডোগরা থেকে ভোরের আলোয় পৌঁছানো যাবে। শিলিগুড়ির মানুষের ট্রাফিকের খুব সমস্যা, নতুন রাস্তা হচ্ছে এর ফলে মানুষের অনেক সুবিধা হবে। বাংলার সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণ এসেছে। এই উত্তরবঙ্গ উৎসবে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক মানুষ আসেন। উত্তরবঙ্গ আমার ভালোবাসার মাটি। আমাদের সরকার কামতাপুরি, রাজবংশী, নেপালি, উর্দু, হিন্দি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আরও ২টি হিন্দি কলেজ হবে, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনাও চলছে। দার্জিলিং-এ হিল ইউনিভার্সিটি হচ্ছে, কার্শিয়াঙে শিক্ষা হাব হচ্ছে, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মালদায় বিমানবন্দর হচ্ছে। বালুরঘাট, কোচবিহারেও বিমান পরিষেবা চালু হবে। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন উত্তরবঙ্গ যা চেয়েছে আমি প্রাণ ঢেলে দিয়েছি, ক্ষমতায় আসার পরেও আমরা অনেক উন্নয়নের কাজ করেছি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করা হয়েছে।

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ আমার দুই ভাই-বোন। আপনাদের সাহায্যের জন্য আমি বারবার এখানে ছুটে আসি। দিল্লিতে গিয়ে দরবার করার দরকার নেই, যা দরকার আমরা সব করে দেব। আপনারা ভালো থাকুন, শান্তিতে থাকুন। আমরা চাই পাহাড়ের মানুষ ভালো থাকুক, শান্তিতে থাকুক। অনেক কাজ হয়েছে, আরো কাজ করা হবে, যথাসাধ্য মতো করা হবে, প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি থাকবে না।

২০১৯ আপনাদের সকলের জীবনে খুশির বার্তা, ভোরের আলো নিয়ে আসুক।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উৎসব ২০১৯-এর উদ্‌বোধন করেন ২১ জানুয়ারি। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে এই উৎসব চলবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায় অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জুড়ে এই উৎসব পালন করা হবে। বিগত ২০১২ সাল থেকেই এই উৎসব চলছে, উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি রক্ষা, প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে। এদিন শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক কাজ, সাংবাদিকতা ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের ৯ জন বিশিষ্টজনকে 'বঙ্গ রত্ন' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মিরিককে ঢেলে সাজার পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর

মিরিককে মডেল পর্যটন কেন্দ্র করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আগ্রহে প্রশাসন ইতিমধ্যে সেখানে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সমীক্ষা শুরু করেছে। মিরিক কলেজের পাশে সানরাইজ পয়েন্ট, মিরিক লেকের কাছে ইয়ুথ হস্টেল, পাহাড়ি গ্রামগুলিতে হোম স্টে তৈরির সমীক্ষা চলছে এখন। ১০০ শয্যার হাসপাতাল তৈরির কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে সেখানে। পর্যটনমন্ত্রী বলেছেন, ''মিরিকে আমরা পর্যটনের জন্য বেশ কিছু কাজ হাতে নিয়েছি। সেই কাজের দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মিরিকে মডেল পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে চান।''

নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন

সবাইকে নিয়ে যে চলতে পারে সেই দেশের আসল নেতা: মুখ্যমন্ত্রী

২০১৪ সাল থেকে রাজ্য সরকার সরকারিভাবে প্রতি বছর ২৩শে জানুয়ারি দার্জিলিং-এ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী পালন করে।

দার্জিলিং-এ নেতাজি বেশ কিছুদিন থেকেছিলেন। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন সরকারিভাবে রাজ্যস্তরের 'সুভাষ উৎসব' পাহাড়ে অনুষ্ঠিত করার। নেতাজির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সারা রাজ্যজুড়ে ব্লকে ব্লকে বসে আঁকো, প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতা, পদযাত্রা, প্রদর্শনী, ক্যুইজ ও বিতর্কসভার আয়োজন করা হয়েছে যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে। নেতাজি পাহাড়ে যে বাড়িতে থাকতেন তা সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে এবং নেতাজির ফাইলও প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার।

দার্জিলিং-এ নেতাজির জন্মবার্ষিকী উপলেক্ষে সরকারি এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৩৬ সালে নেতাজি কার্শিয়াঙ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছিলেন। তাই আমরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দার্জিলিঙে এসে পাহাড়বাসীর সঙ্গে একসাথে নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিই। জয়হিন্দ ধ্বনি সুভাষ চন্দ্র বোসের, বন্দেমাতরম বাংলার বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। দেশের সংকটে বাংলাই সর্বদা পথ দেখায়। বাংলার মাটিতেই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। সবাইকে নিয়ে যে চলতে পারে, যে দেশের জন্য শহিদ হয়েছে, সেই দেশের নেতা।

সুভাষ চন্দ্র বোস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করেছিলেন, সেখানে নেপালিদের গোর্খারা ভাগ নিয়েছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বোস প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেছিলেন। নেতাজির জন্মদিনে রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেনি, এটা দুঃখের বিষয়। স্বাধীনতার এত বছর পর আজও নেতাজির মৃত্যু রহস্যজনক, এটা দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয়।

শিলিগুড়িতে পাহাড়ি ভবন হচ্ছে, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও করা হয়েছে, পাহাড়ের ভাইবোনেদের ভালো রাখার জন্য যা যা করার দরকার সব কাজ আমরা করব। লোকসভা ভোটের পর জিটিএ চুক্তির আলোচনা হবে। আমরা ১৬টি উন্নয়ন বোর্ড বানিয়েছি, ৬২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরাই প্রকৃত উন্নয়ন করি, পাহাড়ের উন্নয়ন আমাদের প্রাথমিক কাজ।

দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় রাজ্যস্তরের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং জিটিএ প্রধান, বিভিন্ন জনজাতি উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, উচ্চপদস্থ আধিকারিক, দার্জিলিং জেলার বিশিষ্টজন এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর ভাষণে বলেন যে, নেতাজি সুভাষ ছিলেন সত্যিকারের জাতীয় নায়ক। দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক। তাঁর দেশের জন্য ব্যক্তিস্বার্থহীন উদার চিন্তা, দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, আজও আমাদের সকলের মাথা নত করে দেয়। তিনি আজও আমাদের কাছে মহানায়ক। তাঁর কাছে আমরা সত্যিকারের ঋণী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিমল-তরাই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করেন। এছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-সহ বেশ কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের সূচনা করেন এবং বিরাট সংখ্যক মানুষের হাতে বিভিন্ন জন কল্যাণমুখী প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান করেন।

আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হই না: রামপুরহাটে মুখ্যমন্ত্রী

বীরভূম জেলার রামপুরহাটে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রকল্পসমূহের উদ্‌বোধন ও শিলান্যাস করেন। মঞ্চ থেকে বিভিন্ন পরিষেবাও প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বীরভূম আমাদের রাঙা মাটি। এই মাটিকে কেন্দ্র করে রবি ঠাকুর গান লিখেছিলেন, এখনও বাউলরা এখানে রাস্তায় গান গেয়ে বেড়ান। এই মাটি পবিত্র মাটি, রবি ঠাকুরের ভাবনার মাটি, চিন্তা ও দর্শনের মাটি। এখানে তারা মা-র মন্দির, শক্তিপীঠ আছে, ৫টা সতীপীঠ আছে। আজ এই সভা থেকে ১০ হাজার মানুষকে সরকারি পরিষেবা তুলে দেওয়া হল, কয়েকদিন আগে আমি জয়দেবের মেলায় এসেছিলাম। তখনও ১২ হাজার মানুষকে সরকারি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

বীরভূম জেলায় অনেক কাজ হয়েছে। তারাপীঠ উন্নয়ন কমিটি করেছে রাজ্য সরকার, উন্নয়নের জন্য কয়েক কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ, প্রশাসনিক ভবন হয়েছে।

রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আমি তারাপীঠ মন্দিরের আদলে তারাপীঠ স্টেশন করে দিয়েছিলাম। তারাপীঠের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। ৩০ লক্ষ পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ৯০% শৌচালয় করে দেওয়া হয়েছে। রামপুরহাট, সিউড়ি ও বোলপুরে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকল্প আছে আমাদের রাজ্য সরকারের। তপশিলি জাতি ও উপজাতির পড়ুয়াদের জন্য আমাদের শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ আছে। স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সবুজসাথী সাইকেল দেওয়া হয়। কোনও গরিব মানুষ মারা গেলে, তার সৎকারের জন্য রাজ্য সরকার অর্থ সাহায্য করে। ২০০০-এর বেশি কবরস্থান আমরা সংস্কার করেছি। আমরা শ্মশানের সংস্কার করেছি।

১.৯৪ লক্ষ লোকশিল্পীকে লোক প্রসার প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। বাংলার সব সরকারি স্কুলের ছাত্রীই এখন কন্যাশ্রী। আমাদের কন্যাশ্রী এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। ১ কোটি ৭২ লক্ষ সংখ্যালঘু পড়ুয়া স্কলারশিপ পাচ্ছে। জেনারেল পড়ুয়াদের জন্য রাজ্য সরকার স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ চালু করেছে। বাংলার সাড়ে আট কোটি মানুষকে খাদ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, আয়লার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল, চা-বাগানের মানুষ ৪৭ পয়সা কিলো দরে চাল পায়। আমরা মানুষকে যে স্বপ্ন দেখাই, তা বাস্তবে পরিণত করে দেখাই।

দক্ষতা উন্নয়নে আমরা দেশের সেরা। সারা দেশে ২ কোটি মানুষের চাকরি চলে গেছে। অন্যদিকে, একমাত্র বাংলায় বেকারত্ব ৪০% কমেছে। ১০০ দিনের কাজে বাংলা দেশের সেরা। গ্রামীণ সড়ক তৈরিতে বাংলা দেশের সেরা। ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পে বাংলা দেশের সেরা। ই-গভর্ন্যান্সে দেশের সেরা বাংলা। পরপর পাঁচবার কৃষি কর্মন পুরস্কার পেয়েছে বাংলা।

আগে বাংলা ছিল ২৫ নম্বরে, এখন বহু ক্ষেত্রে বাংলা ১ নম্বর স্থানে। গান্ধীজির মৃত্যুদিবস দিনটিকে আমরা সম্প্রীতি দিবস হিসেবে পালন করি। সত্যমেব জয়তে। সত্যের জন্য লড়ুন। আগামীদিনে বাংলাই সারা দেশকে পথ দেখাবে।

বিশ্ব বাংলা গেটের উদ্‌বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতার মুকুটে যোগ হল নতুন পালক। দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, মুম্বইয়ের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার মতো এবার কলকাতাও পেল বিশ্ব বাংলা গেট বা কলকাতা গেট। নিউটাউনের নবনির্মিত এই গেটের উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৩তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্‌বোধনী মঞ্চ থেকে এই গেটের উদ্‌বোধন করলেন তিনি।

কলকাতাতেও একটি 'প্রবেশ দ্বার' বা গেট হোক, চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের শীর্ষ কর্তাদের। এরপরই কলকাতা গেট তৈরি হল।

নিউটাউন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং গেটের নামকরণ করেছেন। আইআইটি মুম্বই এই গেটের নকশা চূড়ান্ত করেছে। নকশা অনুসারে নিউটাউনের নারকেলবাগান মোড়ে চারিদিক থেকে চারটি পিলার তোলা হয়েছে। ৫৫ মিটার উঁচু পিলারগুলি। সেই পিলারগুলির উপরে মাটি থেকে ২৫ মিটার উচ্চতায় তৈরি হয়েছে ২০০ মিটার পরিধির একটি সুদৃশ্য গোলক। সেখানে থাকছে অত্যাধুনিক রেস্তরাঁ। এই ঝুলন্ত রেস্তরাঁটি চালাবে হিডকো। একসঙ্গে ৪৫ জন কলকাতা গেটে ওঠার সুযোগ পাবেন। ওঠার জন্য তৈরি হয়েছে দুটি লিফট। এছাড়াও থাকছে সিঁড়ির ব্যবস্থা।

মাটি উৎসব

রানি রাসমনি গ্রিন ইউনিভার্সিটির উদ্‌বোধন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারকেশ্বরে বার্ষিক মাটি উৎসবের উদ্‌বোধন করেন। প্রতি বছরের মতো এবছরও কৃষকদের সাফল্যের জন্য তাঁদের মাটি সম্মান পুরস্কারে ভূষিত করেন তিনি। সেই মঞ্চ থেকেই তিনি শিলান্যাস করেন রানি রাসমনি গ্রিন ইউনিভার্সিটি ও চন্দননগরের লাইট হাবের। এছাড়া, কর্মরত মহিলাদের জন্য হস্টেল—যার নাম মুখ্যমন্ত্রী রেখেছেন কর্মাঞ্জলি—এর উদ্‌বোধন-ও করেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলায় ইতিমধ্যেই ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় করেছি আমরা, স্বাধীনতার পর থেকে ছিল ১২, আরও ১০টির কাজ চলছে। কন্যাশ্রী আমাদের ভাবনা, যা সারা বিশ্ব জয় করেছে। কন্যাশ্রী নামে সরকারি গেস্ট হাউস, লঞ্চ, বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মাটি তীর্থ আমাদের ভাবনা। মাটিকে ঘিরেই আমাদের জীবন স্বপ্ন। অর্থাৎ বাংলাই পথ দেখায়। মাটিকে ভালোবেসে আমি একটি কবিতাও লিখেছিলাম, এই কবিতা থেকেই এই উৎসবের কথা ভেবেছিলাম। সিঙ্গুরের জমিহারাদের জমি ফেরত দিতে পেরে আমি গর্বিত। সিঙ্গুরের জমি পুনরুদ্ধারের জন্য কলকাতায় ২৬ দিন অনশন করেছিলাম। সেই দিনগুলির কথা আমার আজও মনে পড়ে।

আমরা কথা দিয়ে কথা রেখেছি। সিঙ্গুরের জমিহারা পরিবারদের আমরা ২৫০০ টাকা করে দিচ্ছি এবং তাদের একটা চালের স্পেশাল প্যাকেজ দেওয়া হয়। শুধু জমি নয়, জমিতে যাতে তারা চাষ করতে পারে সেজন্য তাদের ১০০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। সিঙ্গুরে আজ একটি স্মারকের শিলান্যাস হল, এছাড়াও এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে।

আমাদের সরকার কৃষকবান্ধব। কৃষিজমির খাজনা আমরা মকুব করে দিয়েছি। কৃষিজমির মিউটেশন ফি-ও মকুব করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমির আর মিউটেশন ফি লাগবে না। কৃষকদের ফসল বিমা দিতে হয় না, রাজ্য সরকার দেয়। গত বছর রাজ্য সরকার ৬২৫ কোটি টাকা দিয়েছে আর এবছর ৭০০ কোটি টাকা দিচ্ছে।

আমরা করে দিয়েছি, আমরাই করব। এবার পুরো প্রিমিয়ামের টাকা রাজ্য দেবে। কেন্দ্রের ভিক্ষে আমরা চাই না, আমাদের প্রাপ্য টাকাই দেয় না। আমরা কৃষক বন্ধু প্রকল্প চালু করেছি। যাদের ১ একর জমি আছে, তাদের সরকার বছরে ২ ইনস্টলমেন্টে ৫০০০ টাকা দেবে। ১৮-৬০ বছরের মধ্যে কোনও কৃষক মারা গেলে তার পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দেবে সরকার। এজন্য সরকারের খরচ হচ্ছে ৫০০০ কোটি টাকা। খাদ্যসাথী প্রকল্পে সাড়ে ৮ কোটি লোককে ২ টাকা কিলো দরে চাল দেওয়া হচ্ছে, সরকার চাল কেনে ২৯ টাকায় কিন্তু মানুষকে দেয় ২ টাকায়। অতিরিক্ত ৫০০০ কোটি টাকা খরচে রাজ্য সরকার এই কাজ করছে মানুষের জন্য। জনগণের কাজ জনগণের সরকার করছে।

সারা বিশ্বের প্রায় ১৫০০-১৬০০ প্রকল্পের মধ্যে পাঁচটি সেরা প্রকল্প নির্বাচিত হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে শুধুমাত্র বাংলার প্রকল্প 'সবুজসাথী' ও 'উৎকর্ষ বাংলা' নির্বাচিত হয়েছে। 'উৎকর্ষ বাংলা'-এর মাধ্যমে আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের চাকরির ব্যবস্থাও করা হয়। অনেকে এই 'উৎকর্ষ বাংলা'-র মাধ্যমে চাকরিও পেয়েছে। তার জন্য সারা পৃথিবী আজ সম্মান করছে। সবাই আমাদেরকে ভালোবাসছে। এটাই আমাদের প্রাপ্তি। আজকে দেশে কৃষকরা অসহায় হয়ে পড়েছে। আমরা সবসময়ই কৃষকদের পাশে আছি। আমাদের রাজ্য সরকার কৃষকদের থেকে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কিনবে। এর জন্য আমাদের আরও ৫৫০ কোটি টাকা লাগবে কিন্তু তাও আমরা চাষিদের মদত করব। আইসিডিএস, মিড ডে মিলের জন্য যা আলু লাগবে সবগুলো আমরা চাষিদের থেকে কিনব।

বন্যা বা খরায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আমরা সাহায্য করি। এর জন্য ১২০০ কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি।

আমরা আগামীদিনে বন্যা কমানোর জন্য নতুন প্রকল্প করছি। এই প্রকল্পের জন্য খরচ হবে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি হয়ে গেলে এখানে বন্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলার প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। আরামবাগের জন্য আলাদা করে আরও ৪০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ভারতে যেখানে ২ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়েছে সেখানে বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমেছে।

‘খেলাশ্রী’ সম্মান প্রদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতার নেতাজি ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল খেলাশ্রী সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। খেলাশ্রী প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের কৃতী ক্রীড়াবিদদের সম্মাননা জ্ঞাপন এবং রাজ্যে খেলাধুলো ও ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে এই প্রকল্প চালু হয় এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের খেলাধুলার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং ক্লাবগুলির কিছু স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি যেমন খেলার সরঞ্জাম, খেলার সরঞ্জামগুলি রাখার জন্য কক্ষ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য প্রথম বছর ২ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী তিন বছর ১ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।

এই বছরের সম্মান প্রাপকরা হলেন :

জীবনকৃতী সম্মান

প্রাক্তন ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি
প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

বিশেষ সম্মান

স্বপ্না বর্মন

বিশেষ পুরস্কার

সৌরভ কোঠারি
শিবনাথ দে সরকার
দেবব্রত মজুমদার
ঈশান পোড়েল
রিমো সাহা
সুতীর্থা মুখার্জী
প্রণব বর্ধন
সুমিত মুখার্জি
সপ্তর্ষি রায়
মেহুলী ঘোষ
মৌমা দাস
প্রাপ্তি সেন

জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, জুনিয়র ভলিবল মহিলা দল
জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, সিনিয়র টেবিল টেনিস মহিলা দল
সারা ভারত বিসিসিআই ৫০ ওভারে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন
সিনিয়র ক্রিকেট মহিলা দল

ক্রীড়া গুরু

প্রদীপ কুমার কুন্ডু
কল্যাণ চৌধুরি
মহ আলি কামার
স্বপন সাধু
অমৃতলাল চক্রবর্তী
মিনারা বেগম
তপন চন্দ্র

বাংলার গৌরব

মুক্তি সাহা
অরূপ ভট্টাচার্য
গার্গী ব্যানার্জী
সত্যব্রত (রাজু) মুখার্জি
রণদেব বসু
শ্যামসুন্দর মিত্র
সুব্রত পোড়েল
চৈতালি চ্যাটার্জী
দেবজিৎ ঘোষ
পরিমল দে
সুধীন চ্যাটার্জী
তুষার রক্ষিত
অজিত সিং
সাগরিকা হাজরা
শ্রেয়সী ব্যানার্জি

খেল সম্মান

রাজশ্রী প্রসাদ
রুবিয়া দাস
উৎসবা পালিত
সৃজিত পাল
অভিমন্যু ঈশ্বরন
সুকন্যা পরিদা
দেবনীতা রায়
পিন্টু মাহাত
সামাদ আলি মল্লিক
কৌশিক কাজী
মন্দিরা হাজরা চৌধুরী
রাম কুমার শা
চিরঞ্জিত চৌধুরি
দীপিকা চৌধুরি
অর্জুন দাস
সতীর্থ বিশ্বাস
স্বদেশ মন্ডল
ঐহিকা মুখার্জী
রনিত ভঞ্জ
তিথি ধাড়া

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দিব্যেন্দু বড়ুয়া দাবা আকাদেমি চালু করা হল। ২০১৩ সাল থেকে আমাদের সরকার খেলাশ্রী সহ জীবনকৃতী সম্মান, বিশেষ সম্মান, বিশেষ পুরস্কার, বাংলার গৌরব, খেল সম্মান প্রদান শুরু করেছে। বাংলার ২২১টি কোচিং সেন্টারকে ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হল। এর আগে গ্রামবাংলার ও শহরের ২৪০০০ ক্লাবকে ৫ লক্ষ টাকা (প্রথম বছর ২ লক্ষ টাকা-পরবর্তী ৩ বছর ১ লক্ষ টাকা) আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে, আজ আরও ৪৩০০ ক্লাবকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হল, আরও ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে আগামী ৩ বছরে। তারা নিজেদের ভাল করে তৈরি করবে।

২০১১ সালে যখন আমরা ক্ষমতায় আসি, তখন ক্রীড়া দপ্তরের বাজেট ছিল ৭৩ কোটি টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৫১৫ কোটি টাকা, ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা কৃতী খেলোয়াড় তাদের কর্মজীবন যাতে সুরক্ষিত হয়, তাহলে তাদের সাহায্য হয়। জঙ্গলমহল, তরাই, ডুয়ার্স, দার্জিলিং ক্লাব সব জায়গায় বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন ক্লাবে পালন হয়, জেলাভিত্তিক যারা চ্যাম্পিয়ন ও কো-চ্যাম্পিয়ন হয়, তাদের সিভিক পুলিশের চাকরি দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২৮১ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শুধু খেলার সময় মনে রাখব, সারা বছর নয় তা হয় না। অনেককে দেখেছি যখন কেউ খেলায় জেতে তখন একটা করে টুইট করে দেয়, কিন্তু সারা বছর কি হচ্ছে কেউ খবর রাখে না। অনেক কৃতী খেলোয়াড় আছে, যারা সম্মান তো দূরের কথা, দু-মুঠো খেতে পায় না। অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়, কেউ নজর রাখে না। যারা পারে না তাদের জন্য স্বল্পকালীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করার ভাবনা করতে বলব, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরকে। অনেক সাংস্কৃতিক দপ্তরের অনেক শিল্পীদের পেনশনের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। যাঁরা বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার পান তাদের শেষ জীবনে চিকিৎসা থেকে শুরু করে অনেক সাহায্য করি। অনেক পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত, কৃতী, সম্মানীয় অভিনেতাদের আমরা সাহায্য করি। সব কিছু প্রচারের জন্য নয়। আন্তরিকতার সম্পর্ক ৩৬৫ দিনের। জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়। তাই প্রতিটি মুহূর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলা জগৎকে আরও উৎসাহিত করা হোক।

সংবাদ শিরোনামে

অশোক মজুমদারের ক্যামেরায় মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন কর্মসূচির নানা মুহূর্ত।

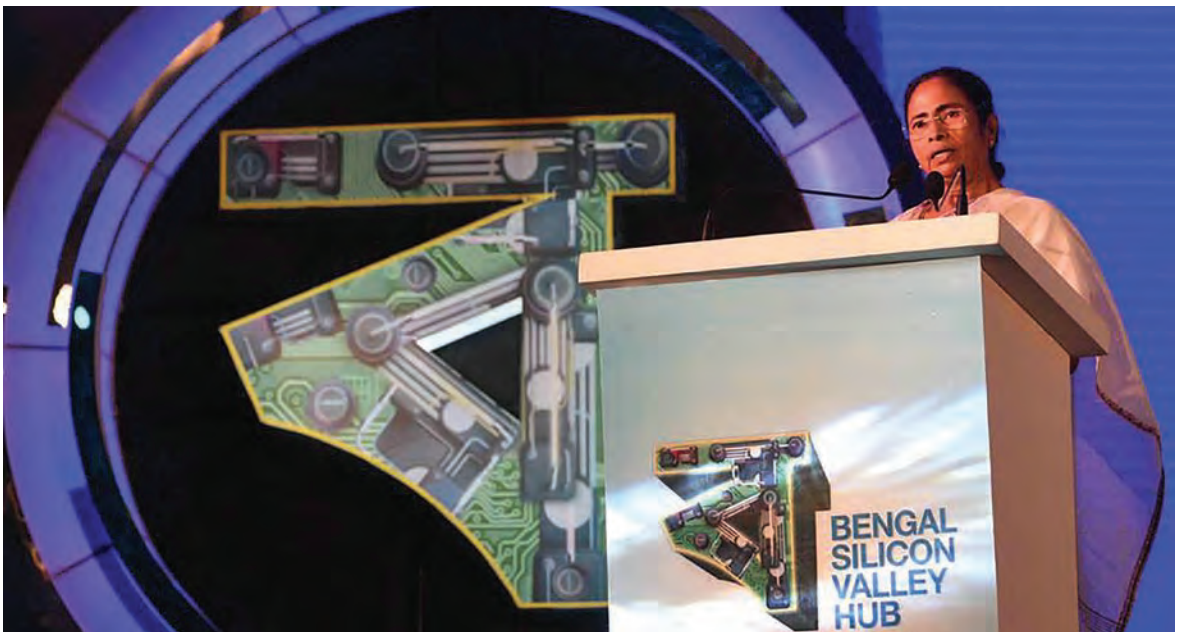

১৩/০৮/২০১৮

বাংলায় শিল্প ক্ষেত্রে নতুন এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি হাব' স্থাপনের কাজ শুরু হওয়া। কলকাতার নিউটাউনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উদ্‌বোধন করলেন এই বিপুল কর্মযজ্ঞের। দেশের মুখ্য তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প সংস্থাগুলি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্য সরকারের নয়া তথ্যপ্রযুক্তি নীতি ঘোষণা করে জানান যে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি রাজ্য বা দেশের সীমা ছাড়িয়ে আগামীদিনে বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। তিনি আরও জানান যে রিলায়েন্স গ্রুপ কলকাতায় উন্নত মানের 'ডাটা সেন্টার'-এর কাজ শুরু করছে এবং আমাজন, ফুজি-সফট-এর নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে। এছাড়া, পুরুলিয়া, মালদা, শিলিগুড়িতে নতুন তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের উদ্‌বোধন করা হয় এদিন। 'উৎকর্ষ বাংলা' নামে এক অনলাইন পোর্টালের উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৪/০৮/২০১৮

কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চম 'কন্যাশ্রী দিবস' পালিত হল। সারা রাজ্য থেকে আসা হাজার হাজার 'কন্যাশ্রী'-র সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেন, কন্যাশ্রী-দের জন্য তৈরি হবে 'কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়'। এছাড়া কন্যাশ্রী-দের কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন, এখন থেকে রাজ্যের সকল কন্যা সন্তানদের কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার জন্য পরিবারের আয়ের উর্দ্ধসীমা তুলে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আরও বহু লক্ষ ছাত্রী/কিশোরী কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

১৫/০৮/২০১৮

সারা দেশের মতোই মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে রাজ্য জুড়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। সরকারি মূল অনুষ্ঠান ছিল কলকাতায় রেড রোডে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ বাহিনী সুসজ্জিত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রকল্পের বর্ণাঢ্য ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়। এছাড়া ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। বাংলার লোকশিল্পীদের 'লোকপ্রসার প্রকল্প' বাংলার উন্নত বর্ণময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। এদিন উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে পুলিশ বাহিনীর চলন্ত বাইকে নানা কসরত। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য মেডেল প্রদান করা হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে এবং তারপরে পুলিশ-স্মৃতি-স্তম্ভে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

২০/০৮/২০১৮

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে রাজ্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের 'কনক্লেভ'-এর উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। গোটা রাজ্য থেকে এবং দেশ-বিদেশের মোট কমবেশি ৩৫০০ (সাড়ে তিন হাজার) ক্ষুদ্র-কুটির-মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রের প্রতিনিধি-সহ কনক্লেভে উপস্থিত ছিলেন নানান ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ থেকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মার্কেটিং, রপ্তানি, গ্রামীণ উদ্যোগপতিদের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান যে ক্ষুদ্র-কুটির-মাঝারি শিল্পে (MSME) বাংলা আজ দেশের মধ্যে এক নম্বর এবং আগামীদিনে বাংলার এই ক্ষুদ্র-উদ্যোগ বিশ্বের অঙ্গনে স্থান করে নেবে।

২৪/০৮/২০১৮

কলকাতা পুলিশের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'জয় হে' অনুষ্ঠিত হয় নেতাজি ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এই অনুষ্ঠানটি প্রতি বছরের মতো উৎসর্গ করা হয় মূলত পুলিশ কর্মীদের সর্বদা উৎসাহ দেন। তাঁদের ত্যাগ ও সহযোগিতার জন্যই পুলিশ কর্মীরা প্রতিদিন জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারেন। এইদিন মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে কলকাতা পুলিশের টর্নেডো টিমের সদস্যদের এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনার জন্য পুরস্কৃত করেন।

০১/০৯/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এদিন জানান যে বাংলা ফের 'নারেগা' প্রকল্প বা ১০০ দিনের কাজে এক নম্বর স্থান অধিকার করেছে। বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে এই 'নারেগা' প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার দেখে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার সরকারের এই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই প্রথম নয়, এই নিয়ে তৃতীয় বার রাজ্য এই প্রকল্পে দেশসেরার স্বীকৃতি পেল। ১০০ দিনের কাজ রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোচবিহার ও পূর্ব বর্ধমান জেলা দেশের মধ্যে সেরা বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে বাংলা। এই পুরস্কার এই প্রথম ঘোষণা করলো কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, নকশালবাড়ী ব্লকের আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত দেশের মধ্যে সেরা গ্রাম-পঞ্চায়েত বিবেচিত হয়েছে, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে সবচেয়ে ভালো কাজ করার জন্য।

০৬/০৯/২০১৮

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন রাজ্য পূর্ত দপ্তরের সচিব, আধিকারিকদের সঙ্গে। মাঝেরহাট সেতু দুর্ঘটনাকে মাথায় রেখে তিনি পুলিশ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেন যে, কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রতিটি সেতু, উড়ালপুলের পরিস্থিতি বিচার করে কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার। আগামী দিনে যেন কোনওভাবেই রাজ্যে এই ধরণের দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই দিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

১২/১০/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এদিন কলকাতার বড়বাজারের পোস্তায় একটি জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসব সকলকে শান্তি, সমৃদ্ধি, আনন্দ ও একতা প্রদান করুক, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৫/১০/২০১৮

২০১৮ সালের দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে সকলকে শারদ উৎসবের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

১৮/১০/২০১৮

রাজ্যবাসীকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

২৩/১০/২০১৮

কলকাতার রেড রোডে শহরের সেরা প্রতিমাগুলিকে নিয়ে বিশেষ বিসর্জন শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৬ সাল থেকে। মানুষ যাতে বিসর্জনের আগে একসঙ্গে সেরা প্রতিমা দেখার সুযোগ পান, সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই উদ্যোগ নেন। এবছর এই কার্নিভালের তৃতীয় বর্ষ। আলোর সাজে তুলে ধরা হল রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, শিশু সাথী, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, খাদ্যশ্রীর মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে। এছাড়াও বিদেশি পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা হল বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্প ভাবনাকে। এবছর এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৫টি পুজো কমিটি। এদিন রেড রোডের কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের আধিকারিক-সহ বিদেশি অতিথিরা এবং অগণিত সাধারণ মানুষ।

২৬/১০/২০১৮

কলকাতার আলিপুরের অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মানের অতিথিশালা 'সৌজন্য'-র উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এ রাজ্যের এই ধরনের আধুনিক অতিথিশালা এই প্রথম। ২০১৫ সালের জুন মাসে 'সৌজন্য'-র শিলান্যাস ও নামকরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অতিথিশালায় আছে কমিউনিটি হল, কনফারেন্স রুম, স্পেশ্যাল কোর্ট ইয়ার্ড। আন্তর্জাতিক মানের বৈঠক করার সব সুবিধাই থাকছে এই অতিথিশালায়। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট, হাড়োয়া ও ভাঙড়-২ ব্লকে আর্সেনিক-মুক্ত পানীয় জলপ্রকল্প-এর শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী, সৌজন্যের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে।

০১/১১/২০১৮

আসামের তিনসুকিয়ায় বাঙালি হত্যার ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

০৩/১১/২০১৮

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নয়া লগ্নি টানতে আমেরিকার সিলিকন ভ্যালির অনুকরণে রাজারহাট-নিউটাউনে 'বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি হাব' তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। গত ১৩ আগস্ট এর উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। নিউটাউনের সিলিকন-ভ্যালি হাবে জমি চেয়ে আবেদন করেছে ক্যাপজেমিনি, জেনপ্যাক্ট, জি-ই ক্যাপিটাল-সহ অন্যান্য বিশ্বমানের আইটি সংস্থা এবং রিলায়েন্স জিও, টিসিএস ইত্যাদি দেশীয় সংস্থাগুলি। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক গণমাধ্যমে এ কথা জানিয়েছেন। এই আইটি হাবের জন্য চিহ্নিত ১০০ একর জমির মধ্যে ৭৪ একর জমিতে ইতিমধ্যে পরিকাঠামো গড়ে তোলার আবেদন এসেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে কোন সংস্থা কী পরিমাণ জমি চেয়েছে সে বিষয়েও সবিস্তারে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুসারে, রিলায়েন্স জিও-র তরফে ৪০ একর জমি চেয়ে রাজ্যের কাছে আবেদন করা হয়েছে। এছাড়া টিসিএস ২০ একর, ক্যাপজেমিনি ১০ একর এবং ফাস্টসোর্স ৪ একর জমি চেয়ে আবেদন করেছে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবে রূপ পেলে রাজ্যে কয়েক হাজার নতুন কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি হবে।

১৩/১১/২০১৮

ছট পুজোর শুভ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ কলকাতার কয়েকটি গঙ্গার ঘাটে যান এবং পুণ্যার্থদের শুভেচ্ছা জানান। এই উৎসব সকলকে শান্তি, সমৃদ্ধি, আনন্দ ও একতা প্রদান করুক, এই আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৮/১২/২০১৮

আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এদিন নবান্নে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও সচিব স্তরে। আগামী ২০১৯ এর গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব বন্টন করা হয় এদিনের বৈঠকে। অসংখ্য পুণ্যার্থী প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন যে বিগত কয়েক বছরগুলোর মতো এবছরেও গঙ্গাসাগরে আগত তীর্থযাত্রীদের বিমার আওতায় রাখা হবে। তীর্থ যাত্রীদের এবারের বিমা-মূল্য ৫ লক্ষ টাকা।

২১/১২/২০১৮

পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভাল-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বিগত ২০১১ সাল থেকে এই উৎসব সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শীতকালীন এই উৎসব প্রাঙ্গনে ক্রিসমাস ক্যারল, নানারকম খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যতম আকর্ষণ হলো সারা পার্ক স্ট্রিট জুড়ে অনন্য আলোকসজ্জা। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে সামাজিক শান্তি-ঐক্য-সমন্বয় ও পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা এবং প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সম্মানের বিষয়ে সচেতন থাকার বার্তা দেন। এরপর তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ক্রিসমাস উপলক্ষে এক সমাবেশে যোগ দেন।

২৪/১২/২০১৮

বড়দিনের প্রাক্কালে, প্রতি বছরের মতো এ বছরও 'মিডনাইট মাস'-এ অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সকলকে বড়দিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান তিনি।

০৬/০১/২০১৯

নতুন বছরের শুরুতেই সুখবর। এমজিনারেগা বা গ্রামের লোকেদের একশো দিনের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই যে দেশের শীর্ষে, তা জানিয়ে দিলেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। রাজ্যসভা সাংসদের প্রশ্নের জবাবে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বলেছেন, ২০১৭-১৮তে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ লাখ ৫৮ হাজার পরিবার নারেগাতে পুরো একশো দিন কাজ পেয়েছেন। আর নারেগা-তে সবথেকে বেশি কাজের দিন সৃষ্টি করা এবং সবথেকে বেশি খরচ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম। এটা ২০১৭-১৮ সালের হিসাব। এই সময়ে পুরো দেশে ২৯ লাখ ৫৬ হাজার পরিবার নারেগায় একশো দিন কাজ পেয়েছেন। এমজিনারেগা প্রকল্পটি গ্রামের গরিবদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও সাহায্যকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর এই প্রকল্প রূপায়ণের ওপর খুবই জোর দেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে গরিবমুখী বেশ কিছু পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং সফল ভাবে রূপায়ণ করছেন।

০৭/০১/২০১৯

অধ্যাপকদের অবসরের বয়স বাড়ছে, ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা মানুষ তৈরি করেন। তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে অধ্যাপকদের অবসরের বয়স ৬২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হবে। উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যদের অবসরের বয়সও ৭০ হবে বলে জানালেন তিনি। এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গান্ধীজি ও বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত চেয়ার রাখার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। তিনি বলেন, নদিয়ায় কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করা হবে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালেয়র যোগ থাকবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার নিজের ঘর। আমার আপন আশ্রয়। এখানে সকলের ব্যবহার অত্যন্ত মিষ্টি। এখানকার ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক সকলে অন্য চেতনায় বিশ্বাসী। এদিন দুপুর ১টায় নজরুল মঞ্চে শুরু হয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। দীক্ষান্ত ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী। গতবার মুখ্যমন্ত্রীকে ডি-লিট প্রদান করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সে বারও তিনিই দীক্ষান্ত ভাষণ দিয়েছিলেন।

১৪/০১/২০১৯

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে নিজেই রিভিউ মিটিং করলেন মুখ্যমন্ত্রী, নবান্নের সভাঘরে। রাজ্যের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিক স্তরে উন্নিত করার চিন্তাভাবনা চলছে। একই সঙ্গে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা পাশ করছেন, তাঁদের বিভিন্ন স্কুলে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থার কথাও ভাবা হচ্ছে। নূন্যতম যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট। সাধারণ গ্র্যাজুয়েটরা প্রাথমিক স্কুলে ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাবেন। অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রিধারীরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন। ২ বছর ইন্টার্নশিপ শেষে শংসাপত্র দেওয়া হবে।

২৬/০১/২০১৯

৭০তম সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হল কলকাতার রেড রোডে মর্যাদার সঙ্গে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ। এদিন রেড রোডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। সেনাবাহিনী এবং রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ বাহিনীর কুচকাওয়াজ এদিনের অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে। বর্ণময় শোভাযাত্রায় অংশ নেয় রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা।

৩০/০১/২০১৯

গান্ধি প্রয়াণ দিবসটি 'সম্প্রীতি দিবস' হিসাবে পালিত হল। এদিন বীরভূম জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাত্মা গান্ধির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এদিন রামপুরহাটে প্রশাসনিক সভা করেন তিনি। নতুন প্রকল্প উদ্‌বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি ১০ হাজারেরও বেশি উপভোক্তার হাতে তুলে দেন সরকারি পরিষেবা। এদিন তারাপীঠ মন্দিরে উন্নয়নের কাজ সম্পর্কেও খবরাখবর নেন তিনি।

৩১/০১/২০১৯

৪৩তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেলা চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বইমেলার এ বছরের থিম দেশ গুয়াতেমালা। সারা বিশ্বের বইয়ের সম্ভার নিয়ে কলকাতা বইমেলা, সূচনা পর্ব থেকেই কলকাতার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বইপ্রেমীদের এমন সমাগম সম্ভবত বিশ্বের আর কোনও মেলায় হয় না। বইমেলার সকল অনুরাগীদের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। বই আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ৭টি বই প্রকাশিত হয়। এই নিয়ে তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৭।

০৪/০২/২০১৯

অনুষ্ঠিত হল কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের পদক প্রদান অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন পুলিশ কর্মীদের সাহসিকতা ও বিশেষ বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য পদক প্রদান করেন। এছাড়া, ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের কৃষকদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন।

আগামী অর্থবর্ষের (২০১৯-২০) রাজ্য বাজেট পেশ করা হল।

১১/০২/২০১৯

মাধ্যমিক, আলিম, ফাজিল ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩/০২/২০১৯

দিল্লি সফরে আজ নিউ দিল্লির সাকেটে গোর্খা ওয়েলফেয়ার সেন্টার-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪/০২/২০১৯

পুলওয়ামায় নিহত শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

১৮/০২/২০১৯

আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে নিউটাউনে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্‌বোধন হয়। তিনি জানান, এখানে আধুনিক ও ভবিষ্যৎমুখী পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান – স্কুল অব বায়োটেকনোলজি, স্কুল অব অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, স্কুল অব পাবলিক পলিসি, স্কুল অব ইনফরমেটিক্স এবং স্কুল অব আর্থ সায়েন্সেস-এর মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পড়ুয়াদের জন্য, গবেষকদের জন্য একটি মাইলস্টোন এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যে এটি একটি নতুন পালক যোগ করল। তিনি বলেন, তিনি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঐতিহাসিক মুর্হূতের জন্য গর্বিত। তিনি সারা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রেসিডেন্সির পড়ুয়া ও তাঁদের পরিবারদের অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার কলেজ স্ট্রিটের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের হেরিটেজ ক্যাম্পাস এবং নবনির্মিত ক্যাম্পাস দুটির জন্যই সমস্ত রকম সাহায্য করবে।

১৯/০২/২০১৯

বর্ষার আগে রাজ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আজ নবান্নে বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

২০/০২/২০১৯

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে আজ নবান্ন থেকে পরিবেশ বান্ধব ইলেকট্রিক বাস, সি এন জি বাস এবং মহিলাদের মালিকাধীন এবং মহিলা দ্বারা চালিত পিঙ্ক ক্যাব এবং সংস্কার করা যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ডের উদ্‌বোধন করা হয়। তিনি বলেন, ৮০টি ইলেকট্রিক বাস ও ২০টি সিএনজি বাস পরিষেবা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র পথপ্রদর্শক রাজ্য যারা এই বিপুল পরিবেশ বান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি পিঙ্ক ক্যাবের মালিক তথা চালক মহিলাদের অভিনন্দন জানান। তিনি এও বলেন, সরকার গতিধারা প্রকল্পের অন্তর্গত পিঙ্ক ক্যাব পরিষেবার গাড়ির ক্ষেত্রে পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কলকাতার বিশপ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আজ নবান্নে বৈঠক করলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

২৫/০২/২০১৯

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

বাংলার পর্যটন বিস্ময় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের গজলডোবা

গজলডোবায় 'ভোরের আলো' পর্যটন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পটি মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। তিস্তার উপরে গজলডোবা জলাধারকে কেন্দ্র করে ২০৮ একর জমিতে উপরে তৈরি হয়েছে এই প্রকল্প।

অশোক মজুমদার-এর ক্যামেরায়...

এখানে টু-স্টার হোটেল ছাড়াও থাকবে সাইক্লিং, বোটিং এবং ক্যাম্পিংয়ের মতো পরিষেবাও। পাশাপাশি ৬০ একর জমিতে গলফ কোর্স তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী। পাশাপাশি সরস্বতী চা-বাগান থেকে বেঙ্গল সাফারি পার্ক পর্যন্ত ট্রেকিং রুট চালু করা হবে বলেও জানান তিনি।

এই প্রকল্প এলাকার মধ্যেই একটি হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ তৈরি হবে। সেই সঙ্গে হবে একটি বৃদ্ধাশ্রম, একটি থানা এবং একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও। ওদলাবাড়ি থেকে গজলডোবা পর্যন্ত নতুন রাস্তা তৈরিরও পরিকল্পনা নিয়েছে পর্যটন দপ্তর।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভোরের আলো’ এখন থেকে জনপ্রিয় হবে। আগামী দিনের বিস্ময় হবে গজলডোবা। মাঝিদের আজ কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া হল, তাঁদের নৌকা চালানোর সরঞ্জাম দেওয়া হল, তাঁরা যেন লাইফ জ্যাকেট সঙ্গে রাখেন। বেশি সংখ্যক লোক যেন বোটে না তোলা হয়। জলধারা প্রকল্পের আওতায়, যে সব মাঝিরা নৌকা চালিয়ে রোজগার করেন তাঁদের জন্য আধুনিক নৌকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

পর্যটকদের জন্য একটা ফুড ক্যাম্প করা হবে। ওয়াচ টাওয়ার বসানো হবে। এর পাশেই হয়েছে বাংলা সাফারি; সেখানে এলিফ্যান্ট ও জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা রয়েছে। একদিকে জলদাপাড়া অন্যদিকে শুকনা-সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। অনেক কটেজ তৈরি করা হয়েছে।

অন্যদিকে পর্যটকদের আগ্রহ দেখে গজলডোবায় আরও ১৪টি কটেজ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল পর্যটন দপ্তর। গজলডোবা থেকে মংপং এবং দোমোহনি পর্যন্ত বোটিং চালুর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

এখন গজলডোবায় ৬টি রিসর্ট রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে তিনটি সংস্থাকে হোটেল তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টার হোটেল, বাজেট হোটেল, ফুড কোর্ট, গলফ কোর্স, 'হাই এন্ড ইকো রিসর্ট' তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে। এ দিনের সভাতেই 'সুমিত' এবং 'কানেকশন' গ্রুপ গজলডোবায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। শিলিগুড়ির দশ জন বিনিয়োগকারীও হোটেল এবং অন্য সহযোগী ব্যবসা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

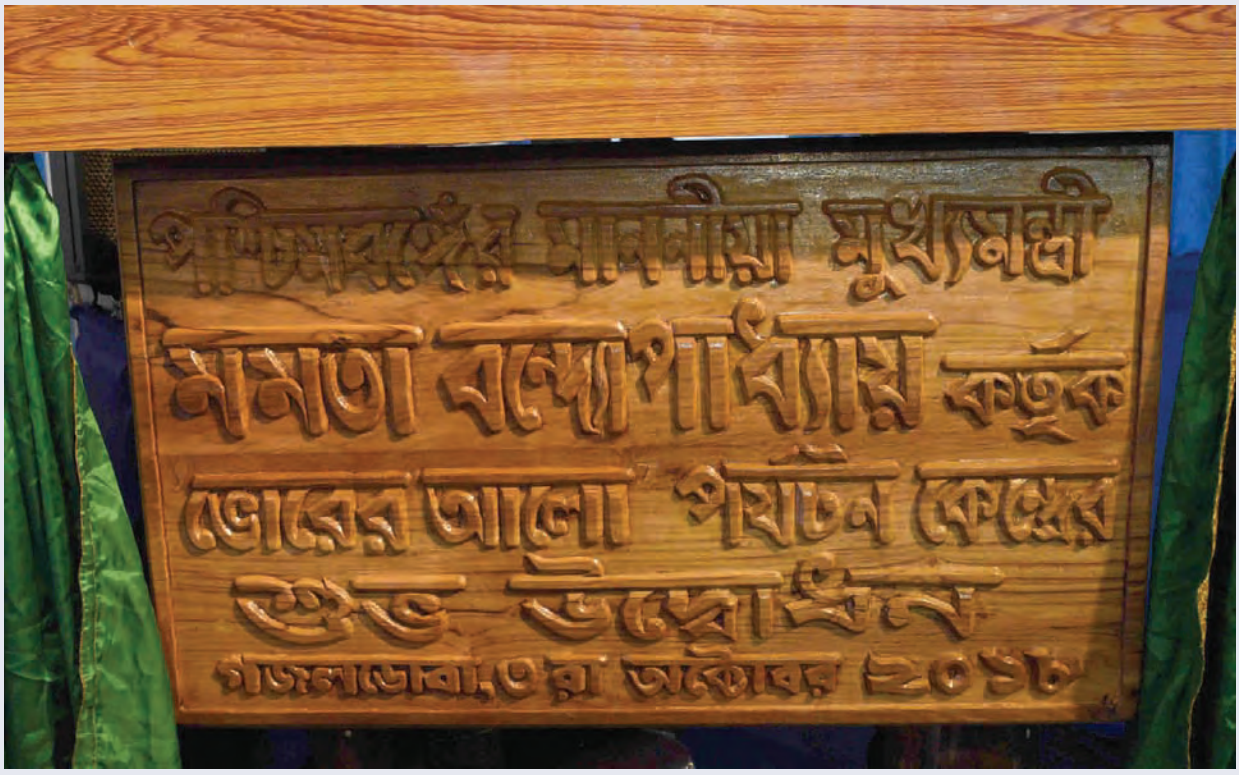
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
ভোরের আলো পর্যটন কেন্দ্রের
শুভ উদ্বোধন
গজলডোবা, ৩রা অক্টোবর ২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, লামাহাট্টার মতো এখানে হোম টুরিজম চালু করা হবে। মানুষ যাতে উন্নত পরিষেবা পায় সেই সব ব্যবস্থা করবে সরকার। এখানে বিশ্ব বাংলার একটা বিপণন কেন্দ্র হওয়া উচিত। এখানকার স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য এখানে বাংলার গ্রামীণ হাট হতে পারে। এর জন্য দু'একর জমি দেওয়া হবে। স্থানীয় শিল্পীদের প্যানেল করতে হবে, একেক দিন একেক শিল্পী শিল্প পরিবেশন করবেন। এর ফলে তাঁদের কর্মসংস্থান হবে। এর মাধ্যমে এই অঞ্চল গৌরবান্বিত হবে। এখানে হোটেল ও হেলিপ্যাড চালু হবে। এখানে পর্যটনের মাধ্যমে অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যেখানে স্থানীয় ছেলে মেয়েরা কাজ পাবে। এখানে অনেক শিল্পপতি এসেছেন আমার সঙ্গে জায়গাটা দেখতে। আমি তাঁদের অনুরোধ করব তাঁদের পরিচিতদের মধ্যে এই জায়গার প্রচার করতে।

শুভ উদ্বোধন
Bengal
ৎাবায়
বর আলো
রিজম হাব

পর্যটন মন্ত্রী বলেন, "বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। চলতি মাসেই গজলডোবাকে নোটিফায়েড এলাকা ঘোষণা করা হবে। প্রস্তাবিত নোটিফায়েড এলাকায় ভ্রামরী দেবীর মন্দির এবং দেবী চৌধুরানীর মন্দিরও থাকবে।"

ফটো ফিচার

উন্নয়নের গঙ্গাসাগর

ছবি: কাজল বিশ্বাস

এই বছর গঙ্গাসাগর মেলার প্রাক্ মুহূর্তে কপিল মুনি মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অশোক মজুমদার

বন্দর গড়ে ওঠার অপেক্ষায় গঙ্গাসাগরের এই সুবিস্তৃত তটভূমি। 'তীর্থের গঙ্গাসাগর' অচিরেই হয়ে উঠতে পারে 'বিশ্ববাণিজ্যের গঙ্গাসাগর'। বিশ্ববাংলার উন্নয়ন ও বিকাশে গঙ্গাসাগর নিতে পারে অন্যতম কেন্দ্রীয় ভূমিকা।

এই অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে তড়িৎগতিতে। ত্রিফলার আলোয় সেজে উঠেছে গঙ্গাসাগর। রাস্তা-ঘাটের উন্নয়নের ফলে পর্যটকরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন মন্দির থেকে মন্দিরে। এক তট থেকে আরেক তটে।

ফটো ফিচার

গঙ্গাসাগর মেলা

বাবুঘাটে সাধু সমাগম

ছবি: সৌরভ দত্ত

মাসাধিককাল চলে বাবুঘাটের সাধু সমাবেশ। সাধুর সেবায় যেমন শিবির করেন বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা, তেমনি সাধুরা আসেন নিজেদের ভাবনা বিনিময়ের সুযোগ নিতে।

তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যত্ন নিতে চলে সেবাকার্য। চলে চব্বিশ ঘণ্টাই খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য সহযোগিতার কাজ। কৌতূহলী মানুষেরাও আসেন সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে। তাঁদের ক্ষমতা অনেক—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই এসে মিলিত হন এখানে।

তরুণী থেকে প্রবীণা—সকলের কাছেই এদের আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। আধ্যাত্মিকতার ধারা এইভাবেই যুগে যুগে প্রবাহিত হয়। গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে এই সনাতন ধর্মের ধারাও আবহমান কাল ধরে বয়ে চলেছে।

বিভিন্ন শিবিরে খাবারের আয়োজন চলে। লক্ষ লক্ষ সাগর-যাত্রীর অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে বাবুঘাট। সরকারিভাবে সেখানে পর্যটকদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এই মেলাকে কেন্দ্র করে বাংলা হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থেই যেন এক 'ছোট্ট ভারতবর্ষ'। বাংলার মানুষের আকাশের মতো বিরাট হৃদয়ে চিরায়ত ভারতের অবস্থান। বাংলা সেজন্য চিরকাল ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রয়াণ : মুখ্যমন্ত্রীর শোকজ্ঞাপন

২০১৮-র শেষবেলায় চলে গেলেন বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রত্যেকের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হায়দার আজিজ সফি

(১৯৪৫-২০১৮)

প্রয়াত হলেন রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার এবং ২০১১-২০১৬ রাজ্যসভার সদস্য হায়দার আজিজ সফি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। ১২ ডিসেম্বর সকালে নিজের বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি অত্যন্ত সম্মানীয় ও বর্ষীয়ান ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যু আমাদের এক অপূরণীয় ক্ষতি। এই শোকের মূহূর্তে আমি সফি সাহেবের শোকসন্তপ্ত পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

অরুণ ভাদুড়ি

(১৯৪৩-২০১৮)

প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী অরুণ ভাদুড়ি। তাঁর মৃত্যুতে সংগীত জগতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ১৭ ডিসেম্বর তিনি প্রয়াত হন। প্রত্যেক সংগীতশিল্পীর ভিন্ন ধরনের প্রয়াসকে তিনি সাধুবাদ জানাতেন। শিল্পীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মহান শিল্পীকে বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁর মৃত্যুতে শিল্প-সংস্কৃতি জগতে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

নিরুপম সেন

(১৯৪৬-২০১৮)

প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ২৪ ডিসেম্বর সকালে সল্টলেকের এক হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী নিরুপম সেন প্রয়াত। তাঁর পরিবার, শুভানুধ্যায়ীদের সমবেদনা জানাই। প্রসঙ্গত, নিরুপম সেনের জন্ম এবং পড়াশোনা বর্ধমান জেলাতে।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

(১৯২৭-২০১৮)

প্রয়াত হলেন স্বর্ণযুগের শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। রাজ্য সরকারের তরফে তাঁকে গান-স্যালুটে শেষ বিদায়ের পাশাপাশি শ্মশানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। ২৪ ডিসেম্বর

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। আকাশবাণীর 'মহিষাসুরমর্দিনী'-তে তাঁর গাওয়া 'জাগো দুর্গা' শ্রোতাদের স্মৃতিতে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগতস্তরে দ্বিজেনদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুমধুর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২০১১ সালে বঙ্গবিভূষণ, ২০১২ সালে সংগীত মহাসম্মান প্রদান করেছে। এছাড়া তিনি পদ্মভূষণ, সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার-সহ অগণিত পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। দ্বিজেনদার প্রয়াণে এক বড় অধ্যায়ের অবসান ঘটল। তাঁর প্রয়াণ সংস্কৃতি জগতের বড় শূন্যতার সৃষ্টি করল। আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় তিনি উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। আমি প্রয়াত দ্বিজেনদার আত্মীয়পরিজন-সহ অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(১৯২৪-২০১৮)

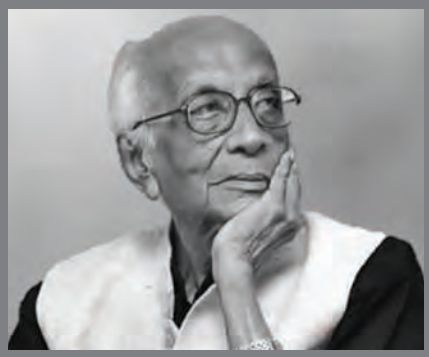

প্রয়াত হলেন 'কলকাতার যীশু'-র স্রষ্টা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ২৫ ডিসেম্বর মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কবির জন্ম ১৯২৪-এর ১৯ অক্টোবর, অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলায়। বিশ্ব কবি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কবির প্রয়াণে আমি শোকাহত। এটা আমাদের সকলের জন্য একটি বড় ক্ষতি। বাংলা সাহিত্যে ওঁর অসামান্য অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা হারালাম বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগের এক মহিরুহকে। 'কলকাতার যীশু', 'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল' বা 'উলঙ্গ রাজা'-র মত কালজয়ী কবিতার স্রষ্টা ছিলেন গদ্য সাহিত্যেও যথেষ্ট সাবলীল। 'টিনটিন'-এর বাংলা অনুবাদ বা 'ডিটেকটিভ ভাদুড়িমশাই' বাংলা কিশোর সাহিত্যে তাঁর উজ্জ্বল অবদান। ১৯৭৪ সালে তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। ২০১৭ সালে তাঁকে আমরা বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করেছিলাম। তাঁর পরিবারকে আমার সমবেদনা জানাই।

মৃণাল সেন

(১৯২৩-২০১৮)

প্রয়াত হলেন বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদপ্রতিম পরিচালক মৃণাল সেন। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ছিল। ৩০ ডিসেম্বর দুপুরে দক্ষিণ কলকাতায় নিজের বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মূলত সামাজিক ও বাস্তবিক বিষয়গুলি নিয়েই তিনি ছবি তৈরি করতেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর মৃত্যুতে চলচ্চিত্র জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। শ্রীসেনের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

দিব্যেন্দু পালিত

(১৯৩৯-২০১৯)

প্রয়াত হলেন বাংলার কথা সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ২০১৯-এর ৩ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দিব্যেন্দু পালিত-এর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করছি। প্রয়াত লেখকের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরনামা

লক্ষ্য শিল্পায়ন: মুখ্যমন্ত্রীর জার্মানি ও ইতালি সফর

এগিয়ে বাংলা।

বদলে গেছে বাংলা।

পশ্চিমবঙ্গ আজ শিল্পায়নের 'বিশ্ববাংলা'।

দুই বছর আগে ২০১৬ সালে জার্মান শিল্পপতিদের বিনিয়োগের আহ্বান জানাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গিয়েছিলেন মিউনিখ শিল্প সম্মেলনে। ২০১৮ সালে আবার ইউরোপ সফরে তিনি। ১২ দিনের সফরে জার্মানি ও ইতালির শিল্পপতিদের সামনে তুলে ধরলেন বাংলায় বিনিয়োগের পথদিশা। ছবিতে লেখায় সেই সফরনামা এই প্রতিবেদনে....

১৬/০৯/২০১৮

ইউরোপ সফরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জার্মানি ও ইতালির শিল্প বাণিজ্য মহলের আমন্ত্রণে তাঁর ১২ দিনের সফর। রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ আনার লক্ষ্য নিয়েই তিনি এবার ইউরোপে। বিগত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন, ২০১৮-তে আমন্ত্রিত ইতালি ও জার্মানির শিল্প প্রতিনিধিদল পাল্টা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফুট' ও ইতালির মিলান এই দুটি শহরে বাণিজ্যিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সফরে সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র।

১৮/০৯/২০১৮

জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফুর্টে এক বাণিজ্যিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকটির আয়োজক ছিল ফ্র্যাঙ্কফুর্টের আই এই চকে, ইন্দো-জার্মান চেম্বার অফ কমার্স, ফিকি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার। জার্মানির নামী শিল্পপতি ও শিল্পগোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৫০জন শিল্প প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এদিনের বৈঠকে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গড়ে তোলার উপযোগিতা নিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক

আলোচনা হয় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় জার্মান বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুলতে চলেছে, বিশেষ করে শিল্প পরিকাঠামো ও লজিস্টিক হাব, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও ফাউন্ড্রি হাব, পেট্রোকেমিক্যাল ও পলিটেকনিক হাব, নগর উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি, ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি, অ্যাগ্রো-ফুড প্রসেসিং, বস্ত্র শিল্প, যন্ত্রাংশ শিল্প, চর্ম শিল্প, পরিবহন শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, পর্যটন এবং সামাজিক পরিকাঠামো প্রকল্প। এছাড়াও রাজ্যের ক্ষুদ্র, মাঝারি কুটির শিল্পে বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

২৪/০৯/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২ দিনের ইউরোপ সফরে এদিনের কর্মসূচি ছিল ইতালির মিলানে। আসোলোম্মারদা, ইতালির বাণিজ্য কমিশন, ফিকি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাংলার এবং ইতালির বৃহৎ বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা এদিনের বাণিজ্য বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পরিকাঠামো, ম্যানুফাকচারিং, ডিজাইন, তথ্য ও সংযোগ প্রযুক্তি, চর্ম শিল্প, বস্ত্র শিল্প, খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, অটো মোবাইল শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা

হয়েছে। বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে সুতো উৎপাদন নিয়ে উচ্চ মাত্রায় আলোচনা হয়েছে। কৃষি যন্ত্র, তাঁত ও হস্তশিল্পের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়েছে। এছাড়া, রাজ্য সরকার শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ইতালির সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদানের দিকটি উন্মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ও ইতালির শিক্ষাজগত, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ উপকার হবে।

২৬/০৯/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ইতালির লোম্বারদি আঞ্চলিক সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রপ্রধান আত্তিলো ফোন্টানার সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন। বাংলা ও লোম্বারদি আঞ্চলিক প্রশাসনের মধ্যে বাণিজ্য, শিক্ষা, পর্যটন, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে দুজন বিশদে কথা বলেন। ২০১৯ সালে কলকাতায় যে বাণিজ্য সম্মেলন হবে, সেখানে ইতালির লোম্বারদি আঞ্চলিক রাষ্ট্রপ্রদানকে আমন্ত্রণ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও জানান যে মাননীয় আত্তিলো সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং উচ্চ পর্যায়ের এক বাণিজ্য প্রতিনিধিদল নিয়ে আত্তিলো ফোন্টানা ২০১৯ সালের বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর

০৯/০৮/২০১৮

বিশ্ব আদিবাসী দিবস এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যস্তরের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন। ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরও সুযোগ করে দিতে ঝাড়গ্রামে এক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেন এদিন তিনি। এছাড়া ঝাড়গ্রাম ও আশেপাশের এলাকার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার্থে ২৪টি নতুন সরকারি বাস-সহ একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা-সহ উক্ত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে আরও গতি আনবে এই প্রকল্পগুলি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য জনজাতিভুক্ত কৃতী ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, জনজাতি মানুষের জীবন-জীবিকাসহ সার্বিক উন্নতির প্রতি সর্বদাই সচেষ্ট ও যত্নশীল রাজ্য সরকার।

০৩/০৯/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন দার্জিলিং-এ পৌঁছলেন। তাঁর এবারের পাহাড় সফরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ছিল। এদিন বিপুল জনতার আবেগ-লালিত উপস্থিতি প্রমাণ করে পাহাড়ের হাসি আরও চওড়া হয়েছে।

০৪/০৯/২০১৮

দার্জিলিং-এ জিটিএ আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকে, পাহাড়ের উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। স্থির হয়, মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ছ-মাসের মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করে পেশ করবে রাজ্য সরকারের কাছে। মংপুতে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হবে, নাম দেওয়া হবে 'দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি', বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে কার্শিয়াং-এ একটি এডুকেশন হাব তৈরি করার কথাও জানান তিনি। কালিম্পং-এ প্রেসিডেন্সির একটি ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। কৃষি, রেশমগুটি পালন, পর্যটন, বিনোদন, তথ্য প্রযুক্তি, সফ্‌টওয়্যার-সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে।

কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত সেতু মাঝেরহাট ব্রিজের একাংশ এদিন আচমকাই ভেঙে পড়ে। উত্তরবঙ্গে সফররত মুখ্যমন্ত্রী এই সংবাদ শুনে প্রবল উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি পাহাড় সফর কাটছাঁট করে দ্রুত কলকাতা ফেরার উদ্যোগ নেন। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় কলকাতাগামী কোনও বিমান না থাকায় তিনি ফিরতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় থেকেই ঘোষণা করেন যে, এই মুহূর্তে উদ্ধার কাজকেই প্রাধান্য দেওয়াই একমাত্র কাজ। আহতদের সমস্ত চিকিৎসার ভার রাজ্য সরকারের, একথা জানিয়ে দেন তিনি। এছাড়া নিহত ও আহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। উদ্ধারকার্যের পর দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

০৫/০৯/২০১৮

এবছর শিক্ষক দিবসের রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠান হল দার্জিলিং-এ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন পাহাড়ের মানুষের বহুদিনের স্বপ্নের সূচনা করলেন দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর থেকে এই প্রথম দার্জিলিং জেলার মংপুতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ও সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। এখানে ট্রাভেল ও টুরিজ্‌ম ম্যানেজমেন্ট, টি-ম্যানেজমেন্ট, হর্টিকালচার, হিমালয়ান স্টাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি, মিডিয়া-সহ বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলির পঠন পাঠন হবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর ভাষণে বলেন যে, এবারের এশিয়ান গেমসে আমাদের রাজ্যের মেয়ে, আমাদের গর্ব স্বপ্না বর্মণ হেপ্টাথলনে সোনা জিতেছে। স্বপ্নাকে তিনি অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা জানান। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এলাকাবাসীদের হাতে

বিভিন্ন পরিষেবা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নতুন প্রকল্প চালু হল এদিন। তাদের জন্য স্কুল ব্যাগ, রেনকোট তুলে দেওয়া হয়। তিনি এদিন বলেন যে, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার তথা পাহাড়ের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বদ্ধ পরিকর।

উত্তরবঙ্গ সফরশেষে কলকাতায় ফিরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোজা চলে যান মাঝেরহাট ব্রিজের দুর্ঘটনাগ্রস্ত অঞ্চলে। উদ্ধার কার্য এবং দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারপর এসএসকেএম হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান, চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ নেন।

০৩/১০/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের গজলডোবায় তৈরি হচ্ছে এক বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র। ২১০ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠবে এই বহুমুখী পর্যটন হাব, নাম 'ভোরের আলো'। উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন এই প্রকল্পটির উদ্‌বোধন করেন। হিমালয়ের পাদদেশে এই জল-জঙ্গল-পাহাড়ময় পরিবেশ সার্বিকভাবেই পর্যটকদের কাছে বিশ্বমানের গন্তব্য হয়ে ওঠার জন্য আদর্শ। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি সকলকে 'ভোরের আলো'য় ভ্রমণের জন্যে আহ্বান জানান।

০৪/১০/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিয়ে শিলিগুড়িতে হিন্দিভাষী মানুষের দ্বারা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এরপর তিনি শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২৯/১০/২০১৮

ফের উত্তরবঙ্গে জেলা সফরে গেলেন মুখ্যন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কোচবিহার জেলা দপ্তরের সামনে নবনির্মিত অডিটোরিয়াম 'উৎসব'-এর উদ্‌বোধন করেন তিনি। এই অডিটোরিয়ামের উদ্‌বোধনের পাশাপাশি এখানে তিনি কোচবিহার জেলার আধিকারিকদের প্রশাসনিক বৈঠক করেন। এই বৈঠকে জেলার উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে আরও গতি আনার নির্দেশ দেন।

৩০/১০/২০১৮

উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে কোচবিহারের রাসমেলা মাঠ প্রাঙ্গণে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জেলায় একগুচ্ছ নতুন প্রকল্প শুরু করা হয়েছে যার মাধ্যমে জেলার স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পরিকাঠামো, যোগাযোগ, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্ম সংস্থান ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। এর মাধ্যমে জেলার সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই উপলক্ষে একগুচ্ছ সরকারি পরিষেবাও প্রদান করা হয়।

৩১/১০/২০১৮

উত্তরবঙ্গ সফরকালীন, জলপাইগুড়ি জেলার টিয়াবন মাঠে একটি সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠান থেকে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার মানুষকে পরিষেবা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু সংখ্যক সরকারি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান যে, ধারাবাহিকভাবে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। উন্নয়নের এই ধারাকেই আগামী দিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ রাজ্য সরকার। এই অনুষ্ঠানের পর জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির খতিয়ান নিতে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সময়মত সাধারণ মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছচ্ছে কিনা তা নিয়েও আলোচনা হয়।

১৫/১১/২০১৮

সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের আমন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন উত্তর ২৪-পরগনার ঠাকুরনগরে মতুয়া সম্প্রদায়ের নেত্রী বড়োমা বীণাপাণি দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। এদিন তাঁরই শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান যে গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে তিনি নিয়মিত বড়োমার বাড়ি আসছেন। মতুয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের ও আন্তরিক। এদিন বড়োমা বীণাপাণি দেবীকে রাজ্যের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ'-এ ভূষিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। ঠাকুরনগরে এদিন তিনি ঘোষণা করেন

যে ঠাকুর হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ-এর নামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে রাজ্য সরকার। তিনি আরও জানান যে মতুয়া সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ মতুয়া উন্নয়ন পর্ষদ নামে একটি নতুন পর্ষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২৬/১১/২০১৮

সংবিধান দিবস উপলক্ষে এদিন দেশবাসীর কাছে, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জঙ্গলমহলে আবার মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ঝাড়গ্রামের জামবনিতে এক সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এদিন বেশ কয়েকটি প্রকল্পের সূচনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ঝাড়গ্রাম জেলার প্রশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেন, জেলার উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখতে।

২৭/১১/২০১৮

জঙ্গলমহল সফরে দ্বিতীয় দিনে পুরুলিয়া জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সচিবালয়ের সদস্যদের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে তিনি উন্নয়ন কার্যের খতিয়ান নেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে সময়মতো পরিষেবা পৌঁছচ্ছে কিনা, সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখেন। এরপর, শিমুলিয়া ব্যাটারি গ্রাউন্ডে হিন্দিভাষী সম্মেলনে উপস্থিত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

২৮/১১/২০১৮

জঙ্গলমহল সফরের তৃতীয় দিনে বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ায় এক সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান-মঞ্চ থেকে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি পরিষেবা প্রদানে উপকৃত হন সহস্রাধিক উপভোক্তা। এরপর, বাঁকুড়া জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে উন্নয়নের কাজ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজের খতিয়ান নেন তিনি। সরকারি আধিকারিকদের সকলেই উপস্থিত ছিলেন এদিনের বৈঠকে।

২৯/১১/২০১৮

জঙ্গলমহলের পর নতুন প্রকল্পের পসরা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। নবগঠিত এই জেলার শ্রীপুরে এক সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করার পাশাপাশি শতাধিক মানুষকে সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন তিনি। এরপর দুর্গাপুরে জেলা ও রাজ্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান জেলার জন্য প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

৩০/১১/২০১৮

জেলা সফরের পঞ্চম দিনে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় এক সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিকাঠামো, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, খাদ্যশস্য সংরক্ষণ-সহ জেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি। এছাড়া সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

০৩/১২/২০১৮

পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে এদিন রাজ্য সরকারের পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান-মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মবার্ষিকীতে এদিন এই অনুষ্ঠান-মঞ্চ থেকেই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন তিনি। একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের সূচনা করার পাশাপাশি ১০ হাজারেরও বেশি মানুষকে সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যবাসীর সার্বিক উন্নয়ন সরকারের অঙ্গীকার, তাই উন্নয়নের স্বার্থে সরকারের সবরকম প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

০৪/১২/২০১৮

রাজ্য ও জেলা আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল, উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখা এবং সাধারণ মানুষের কাছে নির্ধারিত সময়ে পরিষেবা পৌঁছচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া।

০৫/১২/২০১৮

পশ্চিম মেদিনীপুরের পর একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প উপহার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবার পূর্ব মেদিনীপুরে। এদিন বাজকুলে এক সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান-মঞ্চ থেকে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সরকারি পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি পরিকাঠামো, পরিবহন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ, পানীয় জল, সড়ক যোগাযোগ, পর্যটন, নগর সৌন্দর্যায়ন, কর্ম সংস্থান ও শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ হাজারেরও বেশি সংখ্যক উপভোক্তাকে এদিন সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়।

০৬/১২/২০১৮

দীঘায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জন্য প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল, উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখা এবং সাধারণ মানুষের কাছে নির্ধারিত সময়ে পরিষেবা পৌঁছচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া।

২৬/১২/২০১৮

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একের পর এক প্রশাসনিক বৈঠক করেন। জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন মেলায় আশা পূণ্যার্থীদের যেন কোনও অসুবিধা না হয়। এদিন তিনি সুন্দরবন কাপের বিজয়ীদের সভামঞ্চ থেকে পুরস্কৃত করেন।

০৩/০১/২০১৯

বাউল ও লোকসংস্কৃতি উৎসবের উদ্‌বোধন বীরভূমে মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কন্যাশ্রী প্রকল্পের সঠিক লক্ষ্যপূরণ হয়েছে ও বাংলার মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি কন্যাশ্রীর আওতায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা রূপশ্রীর টাকাও পেতে পারেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হবে ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মেয়েদের আরও উন্নততর মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, কৃষিবিমার মাত্র ২০% দেয় কেন্দ্র ও বাকি ৮০% দেয় রাজ্য সরকার। এবার থেকে শস্যবিমার পুরো টাকাই রাজ্য সরকার দেবে। এছাড়াও, সামাজিক সুরক্ষা যোজনা চালু করা হবে। চালু হবে কৃষকদের জন্য আরও কয়েকটি প্রকল্প, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। এছাড়াও, এদিনের সভায় বীরভূমকে নির্মল জেলা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার শিল্প নিয়েও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় প্রায় ২ লক্ষ লোকপ্রসার শিল্পী রয়েছেন ও বাংলার শিল্পীরা বিশ্বজুড়েই সমাদৃত। একই সঙ্গে এদিন, খেলোয়াড় কোটায় প্রায় সাড়ে ৪ হাজার চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

১০/০১/২০১৯

নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন এবং সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কন্যাশ্রী আজ বিশ্বশ্রী। 'কন্যাশ্রী' নামে আমাদের রাজ্যে কন্যাশ্রীর মেয়েদের পড়ার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় দেওয়া হল। এখানে পড়তে গেলে কোনো টাকা লাগবে না। কারণ, এখন সব সরকারি স্কুল-কলেজের ছাত্রীরাই কন্যাশ্রী। কন্যাশ্রীর মেয়েরা আমাদের গর্ব। মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেক দিনের দাবি মেনে আগামী কাল বারাসাত থেকে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিলান্যাস করা হবে। গাইঘাটায় যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে, তার একটা ক্যাম্পাস কৃষ্ণনগরেও করা হবে।

এই জেলায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আইটি পার্ক উদ্‌বোধন করা হল। এতে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। কল্যাণীতে ফ্লিপকার্ট আসছে, সেখানে আরও ১০ হাজার ছেলেমেয়ে সরাসরি চাকরি পাবে এবং পরোক্ষভাবে আরো অনেকের কর্মসংস্থান হবে। নবদ্বীপ হেরিটেজ টাউন এবং মায়াপুর হেরিটেজ টাউন তৈরি হবে। নতুন সিটিও তৈরি হবে। ১১০০ কোটি টাকা খরচে কালনা থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত একটা ব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে। কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচে নদিয়া জেলা সংযোগকারী অনেক চার লেনের রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। নদিয়া জেলায়

মসলিন তীর্থ, তাঁত তীর্থ, ৪টি কলেজ, ৪টি পলিটেকনিক কলেজ, ১০টি আইটিআই কলেজ তৈরি হয়েছে। এই জেলার গবেষকদের আমরা সাহায্য করি। এই জেলায় ১০০ শতাংশ কিষান ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কল্যাণীতে এইম্‌স তৈরি হচ্ছে। কল্যাণীতে আইআইআইটি তৈরি হয়েছে। প্রচুর শিল্প তৈরি হচ্ছে। সব কিছু আমরা করে দিয়েছি। আগামীদিন আরও করে দেব। নদিয়া জেলা চৈতন্যদেবের জেলা, শান্তির জেলা, নবদ্বীপধাম শান্তির ধাম। কৃষ্ণনগরের মাটি কী সুন্দর! পোড়ামাটির কত কাজ হয়, মাটির কাজ হয়। যার জন্য এখানে মৃত্তিকাও তৈরি করে দিয়েছি। এখানকার তাঁত, এখানকার মসলিন, এখানকার লিনেন, এখানকার তাঁতিরা, এখানকার তাঁতশিল্পীরা, এখানকার লোকশিল্পীরা, এখানকার চাষ—সবকিছুই বিখ্যাত। এমনকি নদিয়ার যে মিষ্টি—সরভাজা পাওয়া যায়, সেই সরতীর্থও আমরা তৈরি করছি। যেমন শক্তিগড়ের ল্যাংচাতীর্থ হয়েছে, এখানেও সরতীর্থ আমরা তৈরি করছি।

১১/০১/২০১৯

শুরু হল ২০১৯-এর যাত্রা উৎসব। এবার ২৩-এ পা দিল এই উৎসব। বারাসাতের কাছারি ময়দানের অস্থায়ী মঞ্চ থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ঘণ্টা বাজিয়ে উৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্‌বোধনের পর, দু-দিন ধরে এখানকার অস্থায়ী মঞ্চেই মঞ্চস্থ হচ্ছে যাত্রা। এর পর কলকাতার বাগবাজার যাত্রামঞ্চে এক মাস ধরে চলছে এই উৎসব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর আমরা বারাসাতে যাত্রা উৎসব করি। আমি চাই যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সসম্মানে যাতে বাঁচতে পারেন। প্রায় ৬০০ জন দুস্থ যাত্রাগোষ্ঠিকে নানাভাবে সাহায্য করা হয়। এখন এককালীন ৯ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। এটাকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার করে দেওয়া হল।

১১/০১/২০১৯

দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার। বজবজ ট্রাঙ্ক রোড ধরে গেলে গাড়িতে ঘণ্টাখানেক। সেই রাস্তা বরাবরই তৈরি হয়েছে রাজ্যের দীর্ঘতম উড়ালপুল। তারাতলার জিঞ্জিরাবাজার থেকে বাটা মোড়ে পৌঁছনো যাবে মিনিট দশেকেই। সেই সম্প্রীতি উড়ালপুলের উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপকৃত হবেন গঙ্গাসাগরগামী মানুষও। এতদিন সাড়ে চার কিলোমিটারের 'মা' উড়ালপুলটিই ছিল রাজ্যের দীর্ঘতম।

এখন উড়ালপুল তৈরি হয়ে যাওয়ার পর নীচের বজবজ ট্রাঙ্ক রোডটিও মেরামত করবে কেএমডিএ। তার সুফল পাবেন এলাকার মানুষ। তারাতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, বজবজ সিইএসসির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোলিয়াম সংস্থার ডিপোরও সুবিধা হবে। বদলে যাবে এলাকার ছবিটাই। কামালগাজি থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত ইএম বাইপাসের সম্প্রসারণে আমূল বদলেছে কামালগাজি, নরেন্দ্রপুর, রাজপুর, বারুইপুরের মতো এলাকা। দু-ধারে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বড়ো আবাসন। সম্প্রীতি উড়ালপুল চালু হলে বজবজ, বাটা, মহেশতলা, পূজালির মতো পুর-শহর বদলে যাবে। এই সব পুর-এলাকার অন্তত ১০ লাখ মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, দুই ও চার চাকার গাড়িকে টোল ট্যাক্স দিতে হবে না। সবজি বহনকারী ট্রাককেও টোল ট্যাক্স দিতে হবে না। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ চিরকাল সম্প্রীতির কথা বলেছেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এই সেতুর নাম সম্প্রীতি রাখা হল।

১১/০১/২০১৯

বাবুঘাটে গঙ্গাসাগরগামী পুণ্যার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের পরম্পরা হল আমরা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, দলমত-নির্বিশেষে সকল রাজ্যবাসী মিলেমিশে কাজ করি।

উল্লেখ্য, এর আগে গঙ্গাসাগর মেলায় যেতে কর দিতে হত। নতুন রাজ্য সরকার এসে সেই কর মকুব করে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, 'এর আগে যখন গঙ্গাসাগর গেছিলাম, দেখেছিলাম, ওখানকার কী করুণ অবস্থা। কারোর থাকার জায়গাও ছিল না, বিশ্রামের জায়গা ছিল না। আমাদের সরকার গত কয়েক বছরে ওখানে বিপুল সংস্কার করেছে। মন্দির সংস্কার হয়েছে, অতিথিশালা তৈরি করা হয়েছে। নতুন রাস্তা করা হয়েছে, ঘাট বাঁধানো হয়েছে, নতুন যুব আবাস তৈরি হয়েছে, কটেজ তৈরি হয়েছে। গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। এখন গঙ্গাসাগরে আসতে মানুষের অসুবিধে হয় না। রাজ্য সরকার মেলায় আগতদের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর নজর রাখে।'

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

২০১৮-র কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হল একগুচ্ছ নিবন্ধ। লিখেছেন রাতুল দত্ত। ছবি তুলেছেন অশোক মজুমদার এবং সঞ্জয় সমাদ্দার ও সৌরভ দত্ত।

Kolkata International Film Festival
10th - 17th November, 2018

চলচ্চিত্র উৎসবের বর্ণময় উদ্‌বোধন

‘আগামী বছর কলকাতা আর্ন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৫ বছর পুর্তি। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান হবে সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী স্টেডিয়ামে। ১ লক্ষ মানুষের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। অমিতাভজিকে অনুরোধ করব আগামী বছর আপনার নতুন কিছু ভাবনা আমাদের জানান।’

—মুখ্যমন্ত্রী

উৎসবের রঙ ততক্ষণে ছুঁয়ে ফেলেছে স্টেডিয়ামের কোণায় কোণায় হাজির প্রতিটি মানুষকে। বাইরেও তখন শয়ে শয়ে অপেক্ষমাণ জনতা। লক্ষ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক ঝলক চাক্ষুষ করা। আর ২৪তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী যে চাঁদের হাট বসিয়ে ফেলেছেন এই শহরে, সেই তারকাদের মধ্যে কাউকে যদি একবার দেখতে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বাংলায় সাফল্যের এক গৌরবগাথা তৈরি করেছে প্রাক্-রজতজয়ন্তী বর্ষে, উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা—আগামী বছর এই উৎসবের উদ্‌বোধন হবে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। উপস্থিত থাকবেন প্রায় ১ লক্ষ মানুষ।

নন্দনের ছোট অডিটোরিয়াম থেকে সাত বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন এই উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান সরিয়ে আনলেন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে, সেদিনই বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্রপ্রেমীরাই শুধু

নন, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের কাণ্ডারিরাও বুঝে গিয়েছিলেন—সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ থাকবে না মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য। সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ঘটে গিয়েছে। তাই সকলের জন্য সুযোগ ছড়িয়ে দিতে হবে।

মুঠোবন্দী বিশ্বায়নের যুগেও উৎসবের কোনও বিকল্প নেই। খোলা হাওয়ায় বিশ্ব সংস্কৃতির গভীর জলে অবগাহন যেন এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে মাহাত্ম্যপূর্ণ করে তোলে।

শতবর্ষ অতিক্রান্ত বাংলা চলচ্চিত্র এই উৎসবের একটি উজ্জ্বল বিষয় হয়ে ওঠে। বিশ্ব-চলচ্চিত্র বাংলা চলচ্চিত্রের অবদান আবার স্মরণে আসে। স্মৃতিতে, শ্রদ্ধায় বাংলার মানুষের কাছে এই একশোটি বছর আলাদা মর্যাদা দাবি করে।

24kiff
Kolkata International Film Festival

বাংলার চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের জন্যই নিবেদিত হয় শ্রদ্ধা। এই শিল্পের সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই বাংলার চলচ্চিত্র ধারা আজও অপ্রতিহত।

হাজির গোটা টলিউড। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতের বেশ কয়েকজনও আমন্ত্রিত।

পরের বছর উৎসবকে অন্যমাত্রা দেওয়ার চিন্তাভাবনা এখনই শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আশা, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পর্যায়ে উন্নীত হবে। এই প্রসঙ্গে অমিতাভ এবং শাহরুখ-এর কাছে পরামর্শ ও গাইডলাইন চান তিনি।

উৎসবের রজত জয়ন্তী বর্ষে অমিতাভ বচ্চনকে বিশেষ পরামর্শদাতা হিসাবে থাকার অনুরোধ এখনই জানিয়ে রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা চলচ্চিত্রের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের বর্ষে অমিতাভ মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন, পুরোনো বাংলা ছবির ডিজিটাইজেশন ও সংরক্ষণের উদ্যোগে সাড়া দেওয়ার জন্য।

এদিনের উদ্‌বোধনীর মঞ্চ থেকেই আগামীর উৎসবের দামামা বাজিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হাজার হাজার দর্শকের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর দৃপ্ত ঘোষণা 'বাংলাই পারে হলিউড-কে হার মানাতে।'

পর্দার আড়ালে যাঁরা...

যে কোনও সিনেমার সামনে থাকেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। আর পেছনে থাকেন কলাকুশলীরা যাঁরা তৈরি করেন, তাঁরা। পর্দার আড়ালে যাঁরা থাকেন, তাঁদের কথা ভাবতেই হবে। তাঁদের পরিশ্রমের ফসল হল প্রতিটি চলচ্চিত্র। উৎসব ভাষণে, ২০১৮ সালের ১০ নভেম্বরের সন্ধ্যায়, ক্যামেরার পেছনে থাকা কুশীলবদের কথাই তুলে ধরলেন বিগ-বি, অমিতাভ বচ্চন।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে সবচেয়ে 'প্রেস্টিজিয়াস' বলে উল্লেখ করে অমিতাভ এদিন বলেন, কলকাতা আনন্দের শহর। আমি এই শহরের জামাই। তাই কলকাতা সবসময়ই আমার কাছে স্পেশাল। আমার প্রথম চাকরি কলকাতায়। তাই যখনই বাংলায় আসি, রবি-কবির একটা লাইন মনে পড়ে যায়—আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। বাংলা সিনেমার ১০০ বছর উদ্‌যাপন হচ্ছে। কিন্তু আজ আমরা এমন কিছু মানুষের কথা শুনব, যাঁরা সর্বদা ক্যামেরার পিছনে থাকেন। তাঁদের ছাড়া সত্যিই কোনও সৃষ্টি হতে পারে না।

একটি সিনেমার সামনে যেমন থাকে অভিনয়, নেপথ্যে থাকে 'ক্রিয়েটিভ মাইন্ড-সাউন্ড আর্টিস্ট-কস্টিউম ডিজাইনার-টেকনিশিয়ান প্রমুখ।' প্রত্যেকের পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে ছবি তৈরির পেছনে। শুটিং এর সময়ে, আমরা সবাই সবার ওপর নির্ভর করি। শট রেডি রয়েছে—পরিচালক তৈরি—ক্যামেরা রেডি—জুনিয়র আর্টিস্ট বসে থাকে একটা কাজ করার জন্য—শুরু হয় সিনেমার শুটিং। অনেক পরিচালক থেকে সিনেমাটোগ্রাফার কাজ করে চলেন নেপথ্যে। মানুষ তাঁদের অনেককেই চেনেন না, শুধু তাঁদের কাজ দেখা যায়।

যেমন বিমল রায়। সিনেমা শুরু করার আগে তিনি সহকারী ক্যামেরাম্যানের কাজ করতেন। সিনেমা তৈরি করার আগে ক্যামেরায় কাজ করেছেন ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়ও। গুরু দত্তের মতো মানুষ লিভার ব্রাদার্স-এর কলকাতার কারখানায় টেলিফোন অপারেটরের কাজ করতেন। সিনেমার এডিটিং-এর কাজ করতেন রাজকুমার হিরানি। ফারহা খান কোরিওগ্রাফারের কাজ করতেন। যশ চোপড়া ও সঞ্জয় লীলা বনশালির মতো মানুষরাও চলচ্চিত্র পরিচালনা শুরু করার আগে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কাজ করতেন। পরিনীতি চোপড়া, যশ চোপড়াও প্রোডাকশনের মার্কেটিং-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঋত্বিক রোশন, অভিনয়ে আসার আগে বাবা রাকেশ রোশনের তৈরি সিনেমা কোয়েলা, করন অর্জুন-এর মতো সিনেমায় সহ-পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। সুব্রত মিত্র সিনেমায় আসার আগে স্থির ছবি তুলতেন। কেকে মহাজন, আরডি মাথুরের মতো বিশিষ্ট টেকনিশিয়ানরাও প্রথম জীবনে অন্য ধরনের কাজ করেছেন। কস্টিউম ডিজাইনার ভানু আথাইয়ার নাম ক'জন জানি? তিনি অস্কার পেয়েছিলেন রিচার্ড অ্যাটেনবরোর 'গান্ধি' সিনেমার জন্য।

ছবি: সৌরভ দত্ত

শতবর্ষে বাংলার চলচ্চিত্র

স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সেই স্বপ্ন যেন বাস্তবে রূপ পেল ২৪ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ১১-১৭ নভেম্বর এই উৎসবের হাত ধরে এগিয়ে চলল বাংলায় চলচ্চিত্রের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের দিনগুলো। যে পরিভাষার মোড়কে শুরু হয়েছিল চলচ্চিত্রের যাত্রা, সেই প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাতেই শুরু এই উৎসব।

এতদিন ধরে বাংলা সিনেমাকে যাঁরা জন্ম দিয়েছেন—এগিয়ে নিয়ে গেছেন—যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা এবারের উৎসবে দেখিয়ে দিয়ে গেল, ছবি কথা বলে। চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবনে দেখানো হল—মুক্তি, আলিবাবা, উদয়ের পথে, কাবুলিওয়ালা, গঙ্গা, সপ্তপদী, উত্তর ফাল্গুনী, গণদেবতা, স্ত্রীর পত্র, চোখ, কোনি, পদ্মানদীর মাঝি এবং উনিশে এপ্রিল। একটা সময়ের নির্বাক চিত্র প্রযুক্তির দোলাচলে কীভাবে এগিয়ে আজকের বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তীর্ণ হল, তার একটা ছবি-লেখা যেন ফুটে উঠল এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে। চিরকাল থেকে গেল সিনেমাপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে।

ছবি: সঞ্জয় সমাদ্দার

মুক্তি

পরিচালক—প্রমথেশ বড়ুয়া/১৯৩৭/১২৬ মিনিট/ সাদা-কালো।

প্রমথেশ যুগের এই ছবিতে অভিনয় করেছেন কানন দেবী, মেনকা, পঙ্কজ মল্লিক এবং প্রমথেশ বড়ুয়া। নিজের কর্মজীবনে ২১টি ছবির মধ্যে ১৪টি বাংলা ও ৭টি হিন্দি ছবি তৈরি করেছেন প্রমথেশ বড়ুয়া। ১৯৩৩ সালে তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেওয়ার পর দেবদাস, রজত জয়ন্তী, শেষ উত্তর, চাঁদের কলঙ্ক ইত্যাদি ছবি একের পর এক তৈরি করে গেছেন।

আলিবাবা

পরিচালক—মধু বসু/১৯৩৭/১৬৩ মিনিট/সাদা-কালো।

ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের এই কাহিনি আসলে রঙ্গ নাটক। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন মধু বসু, সাধনা বসু, সুপ্রভা মুখার্জি, ইন্দিরা রায় প্রমুখ। সবাক ছবি হিসেবে সেন্সর করে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লেখা হয়—'এই ছবির সঙ্গে অন্য কোনও ভারতীয় ছবির তুলনা চলে না।'

উদয়ের পথে

পরিচালক—বিমল রায়/১৯৪৪/১২২ মিনিট/ সাদা-কালো।

মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাধারমণ ভট্টাচার্য, বিনতা রায়, রেখা মিত্র, দেবী মুখার্জি প্রমুখ। বিমল রায়ের এটি প্রথম ছবি। এটিও নিউ থিয়েটার্স-এর ছবি। এই সিনেমায় সুর দিয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়াল।

কাবুলিওয়ালা

পরিচালক—তপন সিন্‌হা/১৯৫৭/১০৮ মিনিট/ সাদা-কালো।

মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস, টিঙ্কু ঠাকুর, রাধারমণ ভট্টাচার্য, মঞ্জু দে প্রমুখ। কাবুলিওয়ালার চরিত্রে ছবি বিশ্বাস এবং ছোট্ট মিনির আবদারি চরিত্রে টিঙ্কু ঠাকুর সকলের মন জয় করে নেয়।

গঙ্গা

পরিচালক—রাজেন তরফদার/১৯৬০/১৪৮ মিনিট/ সাদা-কালো।

সমরেশ বসুর লেখা এই বইতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রুমা গুহ ঠাকুরতা, জ্ঞানেশ মুখার্জি, সীতা মুখার্জি, সন্ধ্যা রায়, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ। এই ছবিতে ফুটে উঠেছিল এক মৎস্যজীবীর রোজনামচা। সংগীত পরিচালনায় সলিল চৌধুরী। এই ছবির সম্পাদনায় হৃষিকেশ মুখার্জি।

সপ্তপদী

পরিচালক—অজয় কর/১৯৬১/১৭০ মিনিট/ সাদা-কালো।

'এই পথ যদি না শেষ হয়'—গানটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সপ্তপদীর উত্তম-সুচিত্রা জুটির মুখ দুটি। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুচিত্রা সেন, উত্তম কুমার, ছবি বিশ্বাস, ছায়া দেবী প্রমুখ। ছবির প্রযোজক ছিলেন উত্তম কুমার নিজে। অজয় করের আরও ২টি ছবি 'হারানো সুর' এবং 'সাতপাঁকে বাধা'-র মতো এই সিনেমাটিও আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে।

উত্তর ফাল্গুনী

পরিচালক—অসিত সেন/১৯৬৩/১৩২ মিনিট/ সাদা-কালো।

ড. নীহাররঞ্জন গুপ্তের লেখা এই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন সুচিত্রা সেন, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ মুখার্জি, ছায়া দেবী প্রমুখ। ছবির প্রযোজক ছিলেন উত্তম কুমার। সুচিত্রা সেনের দ্বৈত ভূমিকা-সহ বিকাশ রায়ের অনবদ্য অভিনয় মুগ্ধ করেছিল দর্শকদের।

স্ত্রীর পত্র

পরিচালক—পূর্ণেন্দু পাত্রী/১৯৭২/৮৫ মিনিট/ সাদা-কালো।

রবি-কবির কাহিনী অবলম্বনে তৈরি এই সিনেমায় মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মাধবী চক্রবর্তী, রূপক মজুমদার, অসীম চক্রবর্তী প্রমুখ। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই সিনেমা একটি অনবদ্য চলচ্চিত্র। আজও এই ছবি সকলের মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

গণদেবতা

পরিচালক—তরুণ মজুমদার/১৯৭৮/১৪৮ মিনিট/রঙিন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাহিনি অবলম্বনে তৈরি এই চলচ্চিত্র মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, মাধবী মুখার্জী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীর তীরের এক ছোট্ট গ্রাম শিবকালিকাপুর। তারই প্রেক্ষাপটে তৈরি এই চলচ্চিত্র।

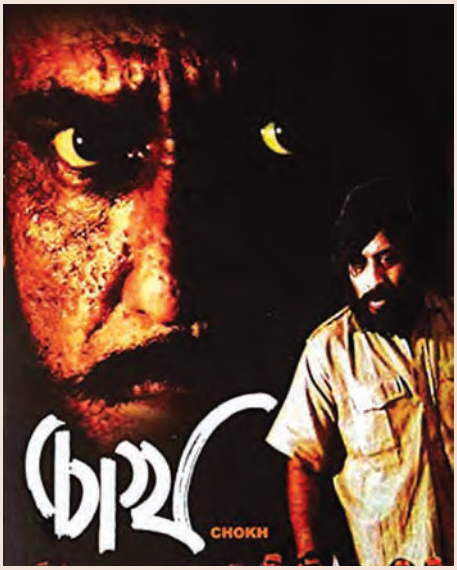

চোখ

পরিচালক—উৎপলেন্দু চক্রবর্তী/১৯৮২/৯৮ মিনিট/রঙিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় তৈরি এই ছবিতে অভিনয় করেন শ্যামানন্দ জালান, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জী, শ্রীলা মজুমদার প্রমুখ। শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম সফল ছবি এটি। সাড়া জাগানো এই ছবি সেরা নির্দেশনা ও সেরা ফিচার ফিল্ম-এর পুরস্কার পায়।

কোনি

পরিচালক—সরোজ দে/১৯৮৬/১২২ মিনিট/রঙিন।

'ফাইট, কোনি, ফাইট'। ক্ষিদ্দার এই কণ্ঠস্বর যেন আজও বাজে প্রত্যেক ক্রীড়াপ্রেমীর কানে। অনুপ্রাণিত করে ছবিকেও। সাঁতারের বিশ্বে উঠে আসে নতুন নতুন প্রতিভা। মতি নন্দীর লেখায় এবং রাজ্য সরকারের প্রযোজনায় এই ছবি জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরূপ দত্ত, শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

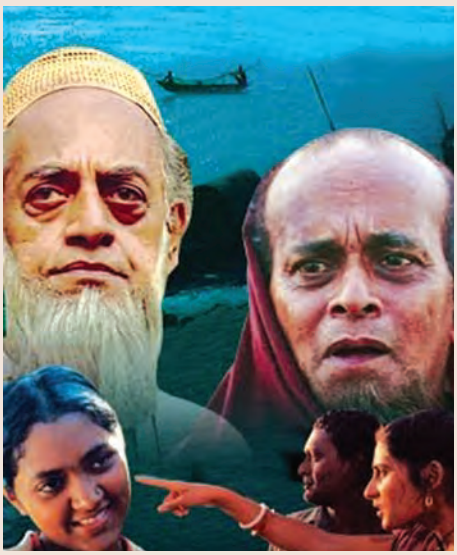

পদ্মানদীর মাঝি

পরিচালক—গৌতম ঘোষ/১৯৯৩/১৩৩ মিনিট/রঙিন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এবং রাজ্য সরকারের প্রযোজনায় এই চলচ্চিত্র হল বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে নির্মিত চলচ্চিত্র। বিখ্যাত এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, রইসুল ইসলাম আশাদ প্রমুখ। আজও ছবিটি সময়ের প্রেক্ষাপটে সমান প্রাসঙ্গিক।

উনিশে এপ্রিল

পরিচালক—ঋতুপর্ণ ঘোষ/১৯৯৬/১৩৩ মিনিট/রঙিন।

এই চলচ্চিত্র দুটি জাতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। আজও এই সিনেমা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অপর্ণা সেন, দীপঙ্কর দে, দেবশ্রী রায়, ইন্দ্রাণী হালদার প্রমুখ।

শতবর্ষ স্মরণে অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্র

একদিকে বাংলা চলচ্চিত্রের শতবর্ষ। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম মুখ অস্ট্রেলিয়া — যে দেশটি শতবর্ষ ধরে তাঁদের চলচ্চিত্রকে শিল্প-সংস্কৃতি-চিন্তা-শিক্ষা-মননে বাঁচিয়ে রেখেছে। সিনেমার ইতিহাসে একটা দেশের শতবর্ষে পা দিয়ে ফেলা একটা অনন্য বিষয়। ২৪তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব সেই অর্থে ব্যতিক্রমী—একসঙ্গে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির জীবনধারাকে এক ছাতার নীচে এনে শতবর্ষ উদ্‌যাপনে সমর্থ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া আজ বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে অনেকটাই এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়ায় ছবিকে বলা হয় 'বুম অ্যান্ড বার্স্ট'; অর্থাৎ বিস্ফোরণ। বলা যায়, বাংলা সিনেমার মতই একসময় নির্বাক চলচ্চিত্র দিয়ে শুরু করে আজ অস্ট্রেলিয়ার সিনেমা পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

শতবর্ষ, কিংবা আরও আগে অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্রে ছিল বর্ণময় দিন। মেলবোর্নের অ্যাথেনিয়াম হল ছিল সে সময় নাচের হল বা সভাগৃহ। ১৮৯৬ সালের অক্টোবরে, এখানেই প্রথম সিনেমা দেখানো হয়। ১৯০৬ সালে নির্বাক চিত্র 'দ্য স্টোরি অব কেলি গাং' সিনেমা দিয়ে শুরু হয় পথ চলা। পরিচালক ছিলেন চার্লস টেইট। মেলবোর্ন শহরে তখন অবশ্য বেশ কিছু পুরনো নামকরা হল ছিল, যেখানে সিনেমা দেখানো ছাড়াও নানা কাজ হত। এভাবে ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ১০০টিরও বেশি সিনেমা তৈরি হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান চলচ্চিত্রে কিছুটা ভাটা পড়ে যায়। তার একটা অন্য কারণও অবশ্য ছিল। একদিকে যেমন অস্ট্রেলিয়ান চলচ্চিত্রের ওপর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে ক্রমশ দর্শকের সংখ্যা কমতে থাকে, অন্যদিকে মার্কিন চলচ্চিত্রের প্রভাব বাড়তে থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯২৩ সালে মার্কিন চলচ্চিত্র ক্রমশ অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্র জগৎকে প্রভাবিত করে ফেলে। ফলে অস্ট্রেলিয়ায় সিনেমা তৈরির খরচও বেড়ে যায়।

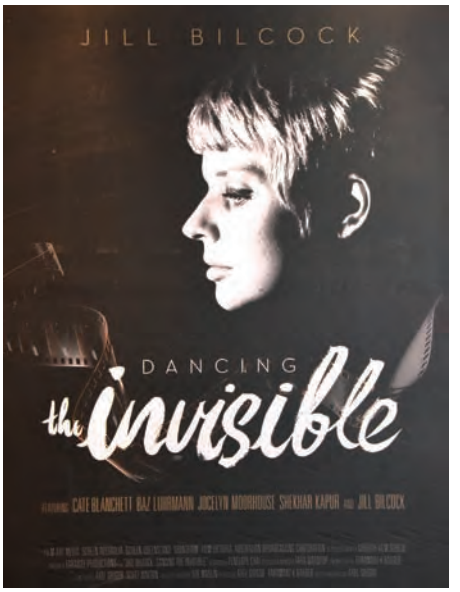

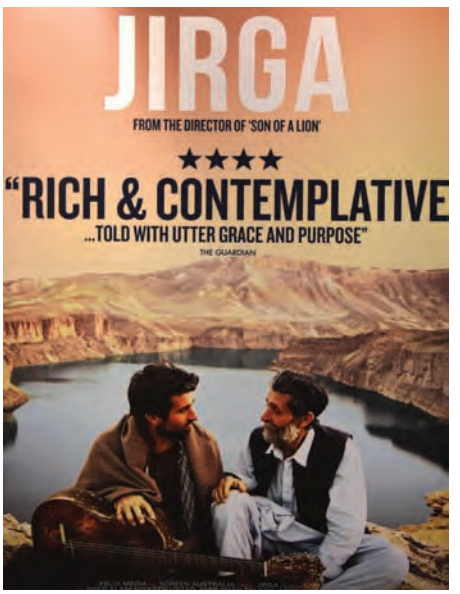

১৯৩০ সালে এফ ডবলু থ্রিং-এর উদ্যোগে তৈরি হয় 'এফটি স্টুডিও' এবং এখানেই পরের বছর তৈরি হয় দুটি সিনেমা—'দ্য হন্টেড বাম' এবং 'এ কো-রেসপনড্যান্টস কোর্স'। ১৯৪৪ সালে চার্লস চৌভেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে তৈরি করলেন 'দ্য র‍্যাটস্ অব টোবরুক'। মূল চরিত্রে অভিনয় করেন পিটার ফিন্‌চ। প্রসঙ্গত, ফিন্‌চ হলেন প্রথম অস্ট্রেলিয়ান অভিনেতা, যিনি ১৯৭৬ সালে অস্কার পুরস্কার পান, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে। ১৯৫৫ সালে তৈরি হাওয়া চলচ্চিত্র 'জেড্ডা' হল অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র এবং এই ছবি কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম অংশগ্রহণ করে। অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্র ইতিহাসে প্রথম অস্কার পুরস্কার আসে ১৯৪২ সালে, 'কোকোদা ফ্রন্ট লাইন' ছবির জন্য। নির্দেশক কেন জি হল। এই সময়ের মধ্যে দুজন উল্লেখযোগ্য অভিনেতা হলেন পিটার ফিন্‌চ এবং চিপস র‍্যাফারটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ায় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বেশ কিছু সিনেমা তৈরি হয়। মূলত ১৯৫০ সালের পর অস্ট্রেলিয়াতে যে ছবিগুলো তৈরি হয়, সেগুলো বেশিরভাগই সেখানকার গ্রামীণ জীবনভিত্তিক। তবে প্রযোজনার অর্থ বেশিরভাগই আসত ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিভিন্ন প্রযোজনা কোম্পানি থেকে। ১৯৫৮ সালে তৈরি হয় অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ম ইনস্টিটিউট এবং এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে চলচ্চিত্রে পুরস্কার প্রদান শুরু হয়। ১৯৬৬ সালে তৈরি হয় বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'দে'আর এ ওয়্যারড মব'। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যেন একটা গতি, একটা পরিবর্তন আসে। যেন একটা নতুন ঢেউ ওঠে।

এই পরিবর্তন বা ঢেউই যেন অস্ট্রেলিয়ায় চলচ্চিত্র জগতে নিয়ে এল এক রেঁনেসা। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালকে তাই রেনেসাঁ বললে অত্যুক্তি হবে না। সেই সময় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন গর্টন, গফ হুইটনাম প্রমুখ সেখানকার চলচ্চিত্র শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই দশকটি আসলে স্বর্ণযুগ। কী কী সিনেমাই না তৈরি হয়েছে সেই সময়! ১৯৬৫ সালের সাদা-কালো ছবি 'ক্লে', ১৯৭৫ সালের 'পিকনিক

অ্যাট হ্যাঙ্গিং রক' কিংবা 'ক্রোকোডাইল ডান্‌ডি'-র মত সফল ছবি মুগ্ধ করে দেশবাসীকে। এই সময় অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্য এবং ইতিহাস থেকেও সিনেমার প্লট এবং বেশ কিছু ঘটনা সংগ্রহ করেন সেই সময়ের বিশিষ্ট পরিচালকরা।

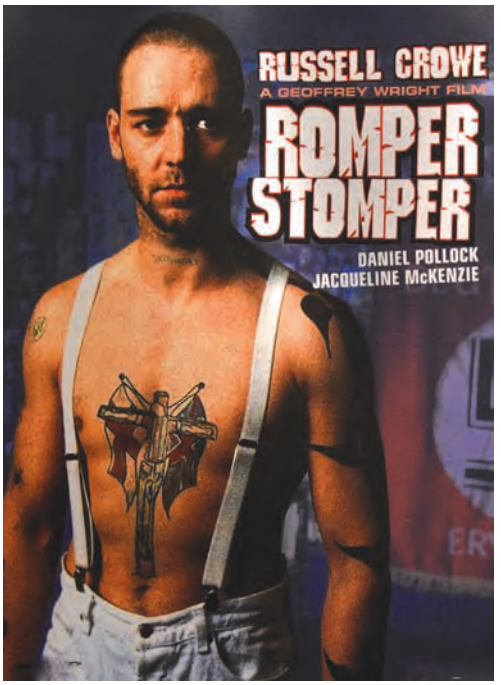

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৮১ সালে তৈরি হয় 'গাল্লিপোলি'। এইসময়ের বেশ কিছু ছবি অস্ট্রেলিয়ার অস্তিত্বকে যেন বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলে, বিশ্বের দরবারে। তবে সে দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কমেডিয়ান অভিনেতা পল হোগানের কথা স্মরণ করতেই হবে। ১৯৮৬ সালে একজন শিকারির গল্প নিয়ে তৈরি সিনেমা 'ক্রোকোডাইল ডান্‌ডি' অস্ট্রেলিয়ায় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নেয়। দেশীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পান হোগান।

১৯৯০ থেকে ২০১০। অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাসে এই ৩০ বছর এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল, বলা যায়। একদিকে কম বাজেটের ছবি তৈরির তাগিদ, অন্যদিকে বিশ্বের দর্শককে মুগ্ধ করে ধরে রাখা—অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্রের রথের চাকা এগিয়ে চলল দুর্বার গতিতে। ফিলিপ নয়েসের 'প্যাট্রিয়ট গেমস' (১৯৯২), জিওফ্রে রাইটের 'রম্পার স্টম্পার' (১৯৯২), ফিলিপ নয়েসের 'ক্লিয়ার অ্যান্ড প্রেজেন্ট ডেনজার' (১৯৯৪), 'দ্য বোন কালেক্টর' (১৯৯৯), 'দ্য কোয়াইট আমেরিকান' (২০০২)—'সল্ট' (২০১০), আনা কোকিনসের 'ব্লেসড' (২০০৯) প্রমুখ কান চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান পেয়েছে কিংবা হলিউডে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।

এ বছরের চলচ্চিত্র উৎসবে অস্ট্রেলিয়ায় সিনেমা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌বোধন হয়েছিল বেশকিছু মূল্যবান পোস্টারও। এসেছিলেন ফিলিপ নয়েস, জিল বিলকক, গ্রার্থ ডেভিস-সহ ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার।

সত্যজিৎ-স্মরণে নন্দিতা

দুপুরের মিঠে রোদ। সন্ধ্যায় আদুরে শীতের রোম্যান্স। জমে উঠেছে ২৪ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। উৎসবের প্রথমদিনেই অষ্টমীর ভিড় নন্দনচত্বরে। মাজিদ মাজিদির অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেউবা জমেছেন সেলফিতে। কেউ আবার ব্যস্ত ফেস্টিভ্যালের প্রোগ্রাম পুস্তিকা নিয়ে। সিনে-বোদ্ধা থেকে সিনে-পাগল। সবাই পৌঁছে গেছেন নন্দনচত্বরে। টলি-ইন্ডাস্ট্রির ব্যস্ততম নায়ক বাতিল করে দিয়েছেন তাঁর সমস্ত শুটিং শিডিউলও। সবকিছুই ফেস্টিভ্যালের জন্য। এরই মধ্যে ভারতীয় ছবির পোস্টারের অন্যতম বিশ্বস্ত মুখ উৎসবের প্রথমদিনের গোধূলিতে 'সত্যজিৎ রায় স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা'-র প্রধান বক্তা হিসাবে দাঁড়ালেন শিশির মঞ্চে।

নন্দিতা বাংলা জানেন। ভালোবাসেন বাংলাকে। তবু বললেন ইংরেজিতেই, যাতে ভাষা কোনও বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। উৎসবটা আন্তর্জাতিক। আর দেশ-বিদেশের সব পরিচালক-প্রযোজকের সমস্যা তো এটাই। সত্যজিৎ স্মারক বক্তৃতায় নন্দিতার স্বকীয় ভাষণে আরও একবার যেন প্রতিধ্বনি হল মহান চলচ্চিত্রকারের চলচ্চিত্র-চর্চার গূঢ়-গহন কথা।

অভিনেতা-পরিচালক নন্দিতা দাশ বিশ্বের চলচ্চিত্র বৃত্তে অত্যন্ত পরিচিত মুখ। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের দু'বারের জুরি। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা নয়-নয় করে ৪০ ছাড়িয়েছে। ছবি পরিচালনাতেও দৃষ্টি কেড়েছেন গুণীজনদের। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নন্দিতা নিজেই পরিচিত ব্যতিক্রমী হিসেবে। দীর্ঘদিন অভিনয় করেন, কিন্তু ফিতে কাটেন না। প্রযোজকের ব্র্যান্ড নয়, বরং চিত্রনাট্যের গুণই তাঁকে আকর্ষণ করে বেশি। এধরনের মানুষ ছবি করলে যে একটু অন্যরকম হবে সেটাই স্বাভাবিক। নন্দিতা দাশ বলছিলেন, সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' বাংলা চলচ্চিত্রে মাইলস্টোন। সে শুধু নন্দনচত্বরে বিচারে নয়, বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যধারার ছবি প্রযোজনা-পরিবেশনা-বিপণনের যে আলাদা একটা জায়গা আছে, তাও বুঝিয়ে দিল। সত্যজিৎ রায় বিশ্বাস করতেন, ভাল ছবির জন্য দরকার ভাল দর্শক। আর তার জন্য দরকার সচেতনতা। সেইজন্যই সত্যজিৎ রায়কে আমরা কখনও দেখি ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলনে, কখনও বা ভালো সিনেমার দর্শক তৈরির জন্য কলম ধরতে। যুগে যুগে চলচ্চিত্রের সব স্রষ্টারাই একই বাধার সম্মুখীন হয়ে এসেছেন।

চলচ্চিত্রকার তো তাঁর ছবির ভুবনে ঈশ্বর। তিনি নিজের মতো গড়েন, নিজের মতো ভাঙেন। চলে অবিরত ভাঙা-গড়ার খেলা। কিন্তু বাজার অর্থনীতি তো চায় পণ্য, যা বিক্রি হবে, মুনাফা হবে। আর সেখানেই স্রষ্টাও চান তাঁর সৃষ্টি হোক দিগন্ত ছোঁয়া। কিন্তু কাল পেরিয়ে তা স্পর্শ করুক মহাকালে। কিন্তু, ঝানু ব্যবসার আদব-কায়দা কখনও কখনও বড় অবুঝ হয়, আর তাতেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায় কত মহান সৃষ্টির সাধনা। বক্তা বলছিলেন, একদা এমনই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্বসূরিরা। 'পথের পাঁচালী' দেখানো জন্য পথে নেমেছিলেন ফিল্ম সোসাইটি, সিনে ক্লাবের সদস্যরা। জীবনের প্রথম ছবিতেই ১৯৫৬ সালে পেয়েছিলেন কান থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ 'মানবিক দলিল'। আর জীবনের সায়াহ্নে পেয়েছিলেন সারাজীবনের জন্য অস্কার। কিন্তু আজও স্বাধীন চিন্তাভাবনা করা ছবি-করিয়েদের সে লড়াই থামেনি। বরং, সুলভ-সহজ প্রযুক্তিতে বিপণনও হয়েছে আরও দুর্গম। 'জনঅরণ্যে' বিপণন না হলে সৎ ছবি-করিয়েকেও হয়ে যেতে হয় 'আগন্তুক'। স্বাধীন ফিল্মমেকারের সীমাবদ্ধতার এমন সব 'শাখাপ্রশাখা'-য় সদ্য তৈরি করা 'মান্টো'-র অভিজ্ঞতায় ভর দিয়ে অনায়াসে-অক্লেশে সেইসব শাশ্বত সমস্যার কথা। সঙ্গে অবশ্যই ছিল মান্টোর 'মান্টো' হয়ে ওঠার কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহানগর' শুনল 'মান্টো'-র নেপথ্যকথন।

ছবি: সৌরভ দত্ত

সিনেমার আড্ডা, আড্ডায় সিনেমা

১১-১৭ নভেম্বর, ২০১৮। দুপুরের মিঠে রোদ গায়ে মেখে, কলকাতা শহর মেতে উঠল জমজমাট চলচ্চিত্র উৎসবে। সঙ্গে নিয়ম করে পৃথিবীর বিশিষ্ট চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের কথা সামনে থেকে শোনার অনুভূতি। সিনেমার আড্ডায় সিনেমার ব্যাকরণকে বুঝে নেওয়ার সুযোগ। একের পর এক সাংবাদিক সম্মেলন, সিনে আড্ডায় ডুবে রইল গোটা নন্দন চত্বর। কথায়, ছবিতে, লেখায় ফুটে উঠল সেই ছবির কয়েক ঝলক—

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ

পুরনো দিনের চলচ্চিত্র সংরক্ষণ নিয়ে রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে হয়ে গেল এক আলোচনাসভা। উপস্থিত ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জয়া বচ্চন, রঞ্জিত মল্লিক, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রমুখ। জয়া বচ্চন বললেন, আমার জীবনে একটাই ধর্ম। তা হল সিনেমা। এছাড়া আমার আর কোনও ধর্মের কথা ভাবতে পারি না। তবে একটা সিনেমা তৈরি করা যেমন কঠিন, তার থেকেও বেশি কঠিন হল তাকে সংরক্ষণ করা। আর আমার বিশ্বাস, এ ব্যাপারে অবশ্যই দেশকে পথ দেখাবে বাংলা। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। ঋতুপর্ণা বলেন, শিল্পী সংসদের সদস্য হিসেবে বিষয়টি অবশ্যই আলোচনায় তুলব।

অনস্বীকার্য, কিন্তু ভালো নয়

পৃথিবীর যে কোনও দেশেই চলচ্চিত্রের সেন্সরশিপ রয়েছে। সেটা ঠিক ভালো নয়। আবার এর অস্তিত্বকেও কোনওভাবে অস্বীকার করা যায় না। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এসে এভাবেই নিজের মতামত জানিয়ে গেলেন ইরানি চলচ্চিত্রের প্রতিনিধি মাজিদ মাজিদি। বর্তমান বিশ্বে তো বটেই, ২৪তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এ বছর তিনি ছিলেন অন্যতম আকর্ষণ। মাজিদির বক্তব্যে ফুটে উঠছিল, সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে ভারত এবং ইরানের সংস্কৃতির সম্পর্কের কথা। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র দেশকালের সীমানা মানে না। 'মহব্বত' আর 'জিন্দেগি' এই দুই শব্দে জুড়ে যায় ভারত-ইরান—গোটা বিশ্ব। মাজিদি বক্তব্য রাখছিলেন, নন্দন-৪ প্রেক্ষাগৃহে।

মনের অনুভূতি

২৪ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম দিনেই সপরিবারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মহেশ ভাট-স্ত্রী সোনি রাজদান-কন্যা আলিয়া ভাট। প্রিয় শহর কলকাতায় বহুবার এসেছেন আলিয়া। মনের অনুভূতি মাখানো এই শহর প্রসঙ্গে বললেন, দিল কা ফিল আতি হ্যায়। 'ইওরস ট্রুলি' ছবির প্রমোশনের পাশাপাশি আলিয়া ভাট এদিন বাংলা ছবি ও বাঙালি পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

বন্ধনের উৎসব

পর্দায় পর্দায় যেন খুলে গেল বিশ্বের জানালা। একদিকে হাজির বিদেশি অতিথিরা, তাঁদের অভিজ্ঞতার ডালি নিয়ে। অন্যদিকে তখন ১৬টি প্রেক্ষাগৃহে চলছে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নানা ছবি। পুরোদমে নানা জায়গায় চলছে 'সিনে আড্ডা'। কোথাও উপস্থিত ছিলেন উৎসবের মুখ্য উপদেষ্টা ও রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, উৎসব সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সাজি এন করুন, অরিন্দম শীল, তনুশ্রী চক্রবর্তী। আবার কোথাও ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, গৌতম ভট্টাচার্য, উৎসব অধিকর্তা মহুয়া ব্যানার্জি প্রমুখ। ১৪ নভেম্বর শিশুদিবসের দিন খুদেদের মাঝে আনন্দে সেলফি তুললেন উৎসব সভাপতি। সপ্তরঙের রামধনুতে তখন রঙিন হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্র উৎসব। একতারা মঞ্চে দর্শকাসনে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি, উৎসব গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছিল কয়েকগুণ। কোথাও

আলোচনা হল, 'হাস্যরস কোথায়?' আবার কোথাও ফোকাল থিম কান্ট্রি অস্ট্রেলিয়াকে সামনে রেখে 'অস্ট্রেলিয়ান সিনেমা—দেন অ্যান্ড নাউ'। ইন্দোনেশিয়ার চলচ্চিত্রকার গারিন নুগ্রহ, মায়া শপ্যাঁ, গৌতম ঘোষ, ওম প্রকাশ, শেখর দাস, জগন্নাথ গুহ, শিবু সুশীলন, এম এন যোশী, কে খারলুসি প্রমুখ উপস্থিত হয়েছিলেন চলচ্চিত্রের নানা দিক নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে দিতে। দীর্ঘদিনের চিত্রসাংবাদিক দেবাশিষ রায় বললেন, চলচ্চিত্র উৎসব আজ যেন বিশ্ব মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। সমস্ত নদী যেমন সাগরে মেশে, তেমনি জাতি-ধর্ম-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ আজ এসে মিশছে যেন নন্দন সাগরে। 'ওয়ার্ড টু রিল' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে উৎসবের নন্দন প্রাঙ্গণে এসেছিলেন দুই দেশের দুই সাহিত্যিক—বাংলার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টোফার সোলকাস। 'দি সঙস অফ সাইলেন্স' সিনেমা দেখতে নন্দন-২ এ পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সঙ্গে এসেছিলেন শ্রীজাত, কৌশিক গাঙ্গুলি, রুদ্রনীল ঘোষ প্রমুখ। অন্যদিকে 'বাংলা গানের সেকাল একাল' নিয়ে আলোচনায় দেখা গেল বাপি লাহিড়ী, উষা উত্থুপ-সহ বিশিষ্ট শিল্পীদের।

ছবি: সঞ্জয় সমাদ্দার, সৌরভ দত্ত

এক ঝলকে

২০১৮-র চলচ্চিত্র উৎসবে 'ফোকাস কান্ট্রি' হল অস্ট্রেলিয়া। সেই উপলক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া সিনেমার ১০০ বছর পূর্তির ওপর নন্দন ফয়ারে প্রদর্শিত হল এক নান্দনিক প্রদর্শনী। এ বছরের 'বিশেষ ফোকাস কান্ট্রি' ছিল টিউনিশিয়া।

- **ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন :** ১৩টি দেশের ১৫টি চলচ্চিত্র
- **কমপিটিশন ইন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ম :** ৯টি ভাষার ১০টি চলচ্চিত্র
- **এশিয়ান সিলেক্ট (নেটপ্যাক পুরস্কার) :** ৪টি দেশের ৬টি চলচ্চিত্র
- **রেট্রোস্পেকটিভ :** অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্র পরিচালক ফিলিপ নয়েজ-এর ৭টি এবং ইরানের মাজিদ মাজিদির ৪টি চলচ্চিত্র।
- **ফোকাস কান্ট্রি :** অস্ট্রেলিয়া (২৬টি চলচ্চিত্র)
- **স্পেশাল ফোকাস :** তিউনিশিয়া (৮টি চলচ্চিত্র)
- **স্পেশাল স্ক্রিনিং :** ৪টি চলচ্চিত্র (সুজিত সরকারের অক্টোবর, মহেশ ভাটের ইওরস ট্রুলি, শিবেন্দ্র দুঁগারপুরের চেকমেট, আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তের জোনাকি)
- **সিনেমা ইন্টারন্যাশনাল :** ৩২ দেশের ৩৮টি চলচ্চিত্র
- **মায়েসত্রোস :** ১৬ দেশের ২০টি চলচ্চিত্র
- **ছোটোদের ছবি :** ২টি দেশের ৪টি চলচ্চিত্র (৩টি ভারতীয়, ১টি কেনিয়া)
- **রেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়ান ফিল্ম :** ৮টি ভাষায় ৮টি চলচ্চিত্র
- **বেঙ্গলি প্যানোরমা :** ৫টি চলচ্চিত্র
- **সেন্টেনারি ট্রিবিউট :** ৮টি চলচ্চিত্র
- **রেস্টোরড ক্লাসিকস :** ৮টি চলচ্চিত্র
- **হোমেজ :** সুপ্রিয়া দেবী, ১টি চলচ্চিত্র
- **প্রদর্শিত ছবি :** ৯৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্য-এর চলচ্চিত্র, ৫৪টি তথ্যচিত্র-সহ মোট ১৫০টি ছবি প্রদর্শিত হয়।
- **১০০ বছরের বাংলা সিনেমা :** ১৪টি চলচ্চিত্র
- **সিনেমার পাঠ :** ফিলিপ নয়েজ

প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার

- অন্যান্য চলচ্চিত্র উৎসবের প্রেক্ষিতে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কার-মূল্য প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকে ৫১ লক্ষ টাকা ও শ্রেষ্ঠ নির্দেশককে ২১ লক্ষ টাকা সহ সুদৃশ্য রয়েল বেঙ্গল গোল্ডেন টাইগার ট্রফি প্রদান করা হয়।
- বাংলা সিনেমার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০১৭ থেকে হীরালাল সেনা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।
- ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতা বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকে ৭ লক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ নির্দেশককে ৫ লক্ষ টাকা-সহ পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- প্রতি বছরের মতো এবছরও শ্রেষ্ঠ এশিয়ান চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করা হয়।
- শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রকে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রকে ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

২০১৮ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেন্টিনারি ট্রিবিউট উৎসর্গ করা হয়েছে ফরাসি চলচ্চিত্র সমালোচক অ্যান্ড্রুজ বেজিন এবং সুইডেনের চলচ্চিত্র নির্মাতা ইঙ্গমার বার্গম্যান-এর নামে।

ডিরেক্টরি প্রকাশ

১৯১৭ থেকে ২০১৭। বাংলা সিনেমার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে উদ্‌বোধনী মঞ্চ থেকে 'বেঙ্গলি ফিল্ম ডিরেক্টরি' প্রকাশ করা হয়।

উদ্‌বোধনী ছবি

এন্টনি ফিরিঙ্গি। সাদা কালো। ১৯৬৭। ১৫৭'। উত্তম-তনুজা অভিনীত ছবি।

১৬ প্রেক্ষাগৃহ

নন্দন-১, নন্দন-২, নন্দন-৩, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, নবীনা, নিউ এম্পায়ার, বসুশ্রী, কার্নিভ্যাল (সল্টলেক), মিত্রা, আইনক্স সিটি সেন্টার-১, নজরুল তীর্থ (নিউটাউন), পিভিআর সিনেমা ডায়মন্ড প্লাজা (দমদম), পিভিআর সিনেমা (অবনি মল, হাওড়া), চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন, এবং নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম (উদ্‌বোধনী ছবি)। হাওড়া ও দমদমে এই প্রথম উৎসবের ছবি প্রদর্শিত হল।

ছবি: সঞ্জয় সমাদ্দার

সমাপ্তিতে বর্ণময় আগামীর অঙ্গীকার

এক বর্ণময় জমকালো আগামীর অঙ্গীকার নিয়ে শেষ হল ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। শহরের বুকে, ২৪তম সিনেমা উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাবু এবং বাপ্পি লাহিড়ী-সহ পরিচালক সুজিত সরকার। সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা সিনেমার শতবর্ষকে শ্রদ্ধা জানালেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। উপস্থিত প্রত্যেকেই বললেন, আগামী বছর কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের ২৫ বছর। সে হিসেবে আগামীর অনুষ্ঠান আরও জমকালো হবে। সেটাই মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন। এদিন চলচ্চিত্রে নানা বিষয়ে সেরাদের রয়্যাল বেঙ্গল ট্রফি এবং পুরস্কারমূল্য হিসেবে চেক প্রদান করা হয়।

সমাপ্তির সেরা কিছু মুহূর্ত

24K
CONGRATULATIONS
Pay Chief Minister's Relief Fund
Rupees Eleven Lakh Eighty Eight Thousand Five Hundred only
₹ 11,88,500/-
For KOLKATA CHALCHITRA UTSAV

24K
CONGRATULATIONS
Pay Film Workers' Association Welfare Fund
Rupees Seven Lakh Thirty Nine Thousand Five Hundred and Twenty only
₹ 7,39,520/-
For KOLKATA CHALCHITRA UTSAV

24K
Pay Hiralal Sen Memorial Award for Best Director in Indian language film
Rupees Five Lakh only
₹ 5,00,000/-
For KOLKATA CHALCHITRA UTSAV

২০১৮-চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত যাঁরা

- **ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস (আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা)—**
  (১) শ্রেষ্ঠ পরিচালক—আবু বকর শওকি (ইজিপ্ট), 'জাজমেন্ট ডে' ছবির জন্য
  (২) শ্রেষ্ঠ ছবি—দ্য থার্ড ওয়াইফ (ভিয়েতনাম), পরিচালক অ্যাশ মেফেয়ার
  (৩) **জুরি স্পেশাল মেনশন—**
  (ক) পরিচালক চূর্ণি গাঙ্গুলির 'তারিখ'
  (খ) পরিচালক আরপদ বোগদানের 'জেনেসিস'
- **সেরা তথ্যচিত্র—**পরিচালক ঈশানী কাঞ্জিলাল দত্ত—'সে চিজ'
- **সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি—**
  (১) পরিচালক গণেশ শেলার—'গাধূল'
  (২) গৌরব মদন—'সম্ভাব্যতা'
  (৩) অশোক ভেইলও—'লুক অ্যাট দ্য স্কাই'
- **নেটপ্যাক (এশিয়ান সিলেক্ট)**—সেরা ছবি—দ্য সুইট রেকুইম
  (পরিচালক—ঋতু সারিন এবং তেনজিং সোনম)
- **হীরালাল সেন স্মারক পুরস্কার (ভারতীয় ভাষার ছবির জন্য)—**
  —'কেদারা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য স্পেশাল জুরি মেনশন পুরস্কার পেলেন কৌশিক গাঙ্গুলি
  —'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে' ছবির পরিচালনার জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেলেন অরিজিৎ বিশ্বাস
  —'উইডো অব সাইলেন্স' সেরা ছবির জন্য পুরস্কৃত হলেন পরিচালক—প্রযোজক প্রবীণ মোরছাল

ছবি: সঞ্জয় সমাদ্দার

আগামী বছর থেকে বাংলার গ্রামে গ্রামে সঙ্গীতমেলা : মুখ্যমন্ত্রী

বাংলা সঙ্গীতমেলা। সঙ্গীতের মহাআসর। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের উত্তীর্ণ মঞ্চে, ১৪ ডিসেম্বর উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে ১৪-১৮ ডিসেম্বর একতারা মুক্ত মঞ্চে সূচনা হল বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করলেন, পরের বছর থেকে সঙ্গীতমেলা হবে গ্রামে গ্রামে, ব্লকে ব্লকে।

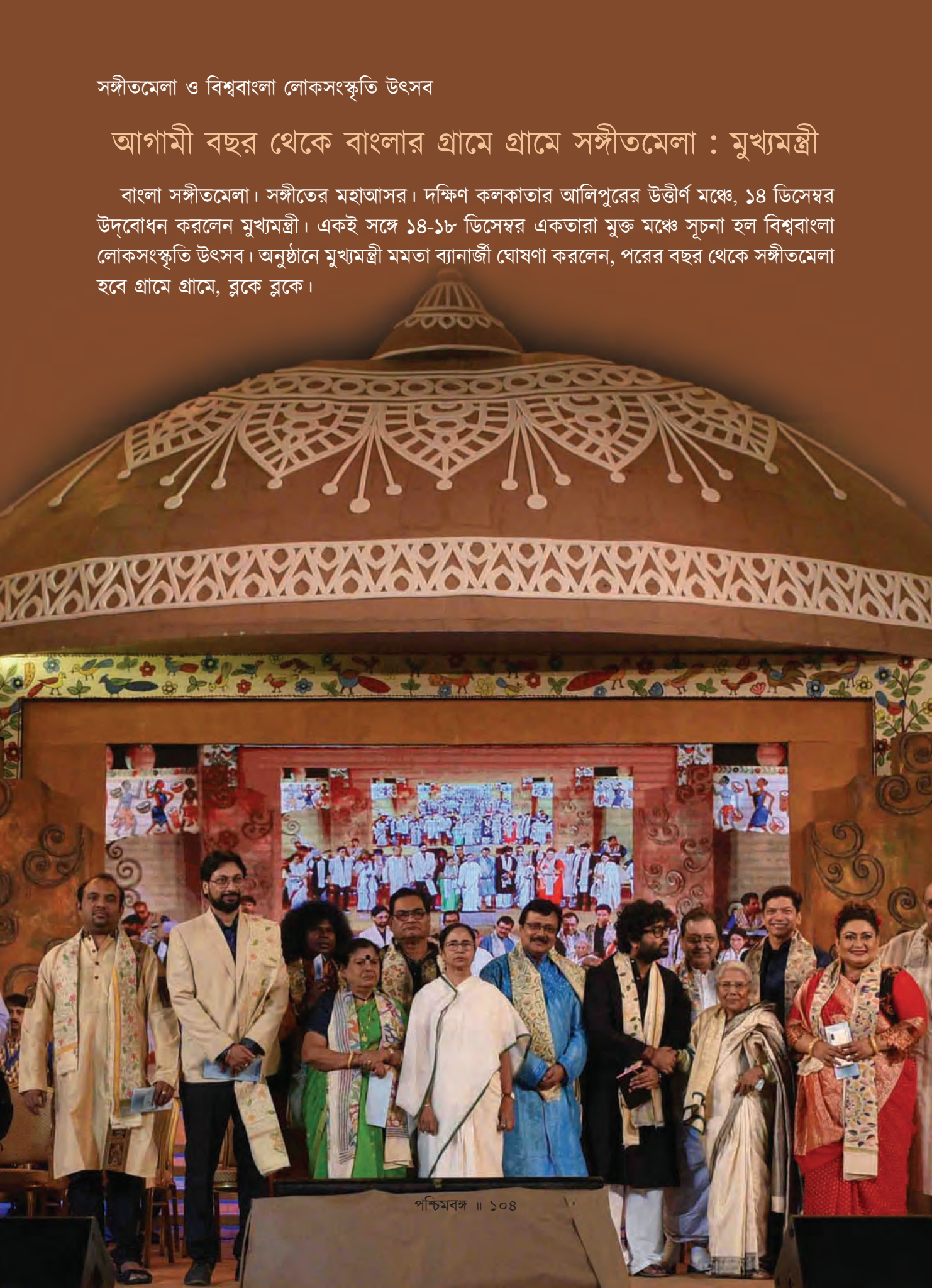

সঙ্গীত মহাসম্মান

অরিজিৎ সিং
শান্তনু মুখোপাধ্যায় (শান)
সৈকত মিত্র (আধুনিক)
শ্রাবণী সেন (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
দেবজ্যোতি মিশ্র (সঙ্গীত পরিচালক)
রূপঙ্কর বাগচি (আধুনিক)
মনোময় ভট্টাচার্য (আধুনিক)
প্রতীক চৌধুরি (আধুনিক)
রাঘব চট্টোপাধ্যায় (আধুনিক)

সঙ্গীত সম্মান

গীতা চৌধুরি (লোকসঙ্গীত)
মৌ মুখার্জি (জোজো) (আধুনিক)
শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভক্তিগীতি)
মানব মুখার্জি (বংশীবাদক)
রাহুল চ্যাটার্জি (সেতারবাদক)
দুর্গা রায় (ভাওয়াইয়া)
অসীম রায় (গম্ভীরা)
মহিম ফকির (ফকিরি গান)
সরস্বতী দেবী (ঝুমুর)
বিভা হাঁসদা (সাঁওতালি গান)
শিবসুন্দর দাস (বাউল)

এদিন তুমুল করতালিতে অভিনন্দিত হলেন মমতা ব্যানার্জী। মুছে গেল গ্রাম-শহরের বিভাজন। সঙ্গীত মেলার উদ্‌বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মঞ্চে আসীন সকলেই সঙ্গীতের সাধক, সঙ্গীতের প্রেরণা। বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির রেশ সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে। বাংলায় জন্ম-কর্ম হলেও, কিন্তু অনেকেই বাংলার বাইরেও নাম করেছেন। নিজের শিকড়কে তাঁরা ভোলেননি। এঁদের গান আমায় অভিভুত করে। সংস্কৃতির কোনও গণ্ডিতে আবদ্ধ হয় না। সুরেরও কোনও গণ্ডি নেই। আমরা গর্বিত যে বাংলায় প্রায় দু-লক্ষ লোকপ্রসার শিল্পী আছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের কার্ড দিয়েছেন। তাঁরা মাসে ১০০০ টাকা করে সাম্মানিক পান এবং সরকারি বিজ্ঞাপন থেকেও তাঁদের কিছু আয় হয়। তাঁদের মাধ্যমে দূরপ্রান্তের গ্রামেগঞ্জে সঙ্গীতকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলছিলেন, গান তো মানুষেরই প্রাণ। যখন জয়দেবের মেলায় যাই, এক-একজন বাউল কী অসাধারণ গান গায়! তাদের সুর, গলা, ছন্দ আমাদের মুগ্ধ করে। আমি নিজে তাঁদের নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র কিনি, উপহার পাই। একতারা, দোতারা নানা ধরনের বাদ্য।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সঙ্গীত সাধনাকে তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কত গান, কত ভাষা, কত আশা, কত আলো, কত সকাল, কত ভোর, কত দিন, কত মধ্যাহ্ন, কত সন্ধ্যা, কত রাত্রি পেরিয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখবেন গান কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণ আছে। গানের কোনওদিন শেষ নেই। সঙ্গীতের কোনওদিন শেষ নেই।

সাংবাদিকদের পেনশন চালু করে মুখ্যমন্ত্রী বোঝালেন তিনি সমাজের সর্বস্তরের জন্যই ভাবেন

দেবাশিস ভট্টাচার্য

উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানার অধীন শালিপুর গ্রামের ২৬ বছর বয়সি রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বছর তিনেক হল রাবেয়ার বিয়ে হয়েছে। সবেমাত্র এক সন্তানের জননী হয়েছেন তিনি। রাবেয়া বললেন, প্রসূতি থাকার সময় আশা কর্মীরা তাঁকে খুব দেখভাল করতেন। আয়োডিন ট্যাবলেট দিতেন। তাঁকে বোঝাতেন, গর্ভস্থ সন্তান ও মা-র শরীর ভালো রাখার জন্য এইসব ওষুধ খাওয়া দরকার। রাবেয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবারও পেয়েছেন। রাবেয়া বলছিলেন, কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করেছেন। এটা খুব ভালো হয়েছে। রাবেয়ার কথায়, 'ওই দিদিরা খুব পরিশ্রম করেন।' রাবেয়া আরও বললেন, যেদিন তাঁর প্রসব যন্ত্রণা ওঠে সেদিন পঞ্চায়েতের সদস্য খবরটা পেয়েই মাতৃযান গাড়ি বাড়িয়ে পাঠিয়ে দেন। সেই মাতৃযান গাড়ি তাঁকে ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। রাবেয়া এর আগেও তাঁর নিজের মা ও ননদের জন্য ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। এখন সেই তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে। মাতৃযান কি জিজ্ঞাসা করায়, রাবেয়া বললেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রসূতি মায়েদের প্রসবের সময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই মাতৃযান গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। রাবেয়া আরও জানালেন, তাদের গ্রামের আশেপাশে তিন-চার বছর আগেও বাড়িতে দাই দিয়ে কিছু প্রসব হত। বছর তিনেক হল এখন সবাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাচ্ছেন। পঞ্চায়েতও বোঝাচ্ছে। এক টাকাও খরচ হয় না।

রাবেয়ার এক ননদ কলেজে পড়ছে। স্কুলে পড়ার সময় কন্যাশ্রীর টাকা পেয়েছে। পেয়েছে সাইকেলও। ২ কিলোমিটার দূরের স্কুল সেই সাইকেলে চেপে যেত। আবার কলেজে পড়ছে বলে কন্যাশ্রী-২ প্রকল্পে একসঙ্গে ২৫ হাজার টাকা পেয়েছে। তার উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা আছে। এটাও জানে, উচ্চশিক্ষা করলে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে সাহায্য করে। তা ছাড়া বিবেকানন্দ মেধা বৃত্তি প্রকল্পও আছে।

রাবেয়ার ননদ চম্পা বলছিলেন যে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবেন এবং কিছু করেন সেটা চোখ খোলা থাকলেই বোঝা যায়। এমনকি মৃত মানুষের সৎকারের সময় সরকার সমব্যাথী প্রকল্প নিয়ে পাশে দাঁড়ায়। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। অনেক পরিবার আছেন, যাঁদের বাড়িতে কেউ মারা গেলে কান্নার রোল ওঠে, একই সঙ্গে পরিবারের মাথারা ভাবেন সৎকারের টাকা কোথা থেকে আসবে। এখন সরকার বলে দিয়েছে, চিন্তা করতে হবে না। সৎকার করে ডেথ সার্টিফিকেট ও শ্মশানের বিল নিয়ে পুরসভা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে গেলেই দু-হাজার টাকা মিলবে।

এ সব প্রকল্প চলছিলই। অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা চাইছিলেন, তাঁদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু করুন। স্বাধীনতার পর থেকেই সাংবাদিকরা এই ইচ্ছা জানিয়েছিল। কোনও সরকার কিছু করেনি। অনেক সময় এই নিয়ে নাটক করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ ডিসেম্বর, ২০১৮ সাংবাদিকদের পেনশন প্রকল্প চালু করে দিলেন। মাসে ২,৫০০ টাকা করে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা পাবেন। প্রথম দিন ৩০ জনের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। চেক কিন্তু ২২,৫০০ টাকার। ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ে ৩০ জন দিয়ে শুরু হলেও আরও অনেক অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের আবেদন বিবেচনা করা হচ্ছে। সাংবাদিকরা এই পেনশন পেয়ে তাঁদের কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, শুরুটা হল এটাই বড়ো কথা। সাংবাদিকদের জন্য কেউ ভাবেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ভেবেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকরাও চিকিৎসার ব্যাপারে মাভৈঃ প্রকল্পের আওতায় এলে ভালো হয়। এমনিতে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা এখন সবার জন্যই ফ্রি। মাভৈঃ প্রকল্প রাজ্য সরকার তিন বছর আগে চালু করেছে। এই প্রকল্পে সাংবাদিকদের পরিবারের সকলের চিকিৎসার ব্যয় সরকার বহন করে। ইতিমধ্যে কর্মরত কিছু সাংবাদিক এবং কিছু সাংবাদিদের পরিবারের লোকেরা এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হয়েছেন।

যে ৩০ জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক পেনশন পেয়েছেন তাঁদের নাম হল—মনোজিৎ মিত্র, বচ্চন সিং সরল, সৌমেন গোস্বামি, শ্যামল সান্যাল, কৃষ্ণকিশোর রায়, মৃণাল কুন্ডু, আমানুল্লা মহম্মদ, বিজিত সাহা, রাজ মিঠুলিয়া, শশী মুখার্জী, অমিতাভ সেন, সীতারাম আগরওয়াল, উদয় ব্যানার্জী, প্রলয় দাস, অমল দে, বিরেন ঘোষ, নিখিল রঞ্জন ভট্টাচার্য, বাদল সান্যাল, জনকলাল সিং, দেবব্রত ভট্টাচার্য, মৃণাল বিশ্বাস, সদানন্দ দাস, শুভময় চ্যাটার্জী, সুনীল দত্ত, জ্যোর্তিময় ভট্টাচার্য, কনকেন্দু মজুমদার, সুশান্ত গুহ, অমৃতলাল মাইতি, তাপস মাইতি, তপন দাস।

প্রসূতি মা ও কন্যাশ্রীর কথা দিয়ে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন পাওয়ার কথা বললেই সবটা বলা হয় না। এর পরেই নতুন বছরে মুখ্যমন্ত্রীর কৃষকবন্ধু প্রকল্পের কথা বলতেই হবে। অনেক রাজ্যেই কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। সরকার নির্বিকার। বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্যা আক্রান্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ালেন। চাষের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন। আবার চাষির মৃত্যুতেও তাঁর পরিবার যাতে অনটনে না পড়ে, সেই জন্য দু-লক্ষ টাকা দিয়ে পাশে দাঁড়ালেন। স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক দুভাবেই মৃত্যুর ক্ষেত্রে সরকার কৃষক পরিবারের পাশে দাঁড়াবে। এ কম কথা!

কৃষকবন্ধু

মরণোত্তর অনুদান ২ লাখ। বছরে ৫০০০ টাকা একর প্রতি। বাংলার কৃষকের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নিরন্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্যতম মাইলস্টোন—'কৃষকবন্ধু' প্রকল্প

বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র কৃষি। রাজ্যে কৃষি কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষ যুক্ত এবং নির্ভরশীল। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের সুফল এই মানুষেরা পাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যবাসী জন্মের আগে থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ায়, জীবনমানের উন্নতি ঘটাতে পেরেছে। বিগত সাড়ে সাত বছরে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি পরিবার এর ফলে উন্নয়নের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে ও সচেতনভাবে যুক্ত হয়েছে। কৃষকদের আয় হয়েছে তিনগুণেরও বেশি। এখন মৃত্যুর পরেও তাদের আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে।

কিন্তু, একথা ভুললে চলবে না যে বাংলার কৃষি আজও অনেকাংশেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এই প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত কৃষি কৃষকের জীবনযাপনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, সবসময় যে ভবিষ্যৎভাবনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেকথা বলা যায় না। কৃষক বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃষকের এই বিপন্নতায় সরকার 'বন্ধু' হিসেবে এগিয়ে আসে। বর্তমানে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের মাধ্যমে এই দুঃসময় মোকাবিলায় এক অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিল সরকার।

এছাড়া মরণোত্তর অনুদান বা বিমার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কোনও 'প্রিমিয়াম' দিতে হবে না কৃষককে। ১৮ থেকে ৬০ বছর—এই বয়সসীমার মধ্যে যে কোনওভাবে কৃষক মারা গেলে মাত্র ১৫ দিনে ২ লাখ টাকা পাবে মৃত কৃষকের পরিবার। উল্লেখ্য, আজও বাংলার

কৃষি অনেকটাই পারিবারিক অর্থাৎ পরিবারের সব সদস্যই কম-বেশি কৃষির সঙ্গে যুক্ত। একজনের মৃত্যু মানে ওই কৃষি-পরিবারে আয়ের একটি উৎস শুকিয়ে যাওয়া। তাই বয়সসীমা ১৮ থেকে ৬০ রাখা হয়েছে। নারী-পুরুষেরও কোনও ভেদ নেই। এই 'মরণোত্তর অনুদান' নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী প্রয়াস।

মা-মাটি-মানুষের সরকার মানবকল্যাণের যে পথে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেছিল, তারই সিদ্ধান্ত এই প্রকল্প। নানা সমস্যায় জর্জরিত কৃষক যখন নিজেকেই শেষ করে দেয়। এই 'হনন' কৃষকের 'আত্মহনন' বলে দায় এড়াতে পারে না সমাজ। সমাজের প্রতিটি সদস্যকেই এর দায় নিতে হবে। আর্থ-সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমেই এই আয় পালনের পাশাপাশি 'সামাজিক ক্ষতি-পূরণ'-এর উদ্যোগ নিতে হবে।

বিশ্ব উন্নয়নে 'মানসম্পদ' অমূল্য। ভারত তথা বাংলার কৃষি 'ঐতিহ্যের কৃষি' হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। বংশপরম্পরায় হাজার হাজার বছর ধরে যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে সঞ্চিত হয় তার মূল্য কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। তাই 'একজন কৃষক'-র মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

উন্নয়নের জন্য সবক্ষেত্রেই পরিকাঠামোগত সংস্কার ও উন্নতি দরকার। কৃষি সর্ববৃহৎ অসংগঠিত ক্ষেত্র। কিন্তু সমাজের উন্নয়নের মূলধারা, বিশেষত ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়, শাসকশ্রেণির সঙ্গে কৃষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জমিদার, রাজা, সম্রাট যেই হোন—কৃষিকে অবহেলা করতে পারে না। কৃষকরাই অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে নানা রকম 'কর' দিয়ে। এই করের জন্য কৃষকের ওপর চলেছে নানা শোষণ, উৎপীড়ন। সংঘবদ্ধভাবে কৃষকসমাজ প্রতিবাদমুখর, কখনও বা আন্দোলনমুখর হয়ে ওঠে। ভারতে বারেবারেই কৃষক-আন্দোলন বা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। বাংলায় এইরকম ঐতিহাসিক আন্দোলন-এর ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান রাজ্য সরকার কৃষি-সংস্কারে একের পর এক নজির সৃষ্টি করে চলেছে।

এই সংস্কারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল—কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিকে সমন্বিত করে কাজ করা। একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রকে মিলিয়ে মিশিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ, নানা ক্ষেত্রের গবেষণাকে বিস্তৃত করে গবেষণার সাফল্যের বাস্তব-প্রয়োগ, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যুক্ত করা, চিরাচরিত কৃষির সঙ্গে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সংমিশ্রণের জন্য প্রশিক্ষণ।

বাংলার মেধাসম্পদ-কে এইসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা ও কৃষি প্রযুক্তির প্রসার বাংলার কৃষিকে প্রকৃত উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিই নয়, জোর দেওয়া হচ্ছে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন। তৈরি হয়েছে কৃষক-বাজার, সুফল বাংলা, সুফলা। রাজ্যে কৃষির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড়ো বড়ো শিল্পপতিরাও বাংলার কৃষির সঙ্গে তাদের ব্যবসা বাড়িয়ে তুলছে। বাংলার কৃষি-বাণিজ্যের প্রতি বণিক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়ছে। সবজি ও ফল উৎপাদনে গবেষণা ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুফল প্রয়োগ করা হচ্ছে। শস্য-বৈচিত্র-র বিষয়টি কৃষকেরা বুঝতে পারছে।

কৃষি-জমির খাজনা মুকুব, মিউটেশন ফি বাতিল, জলসেচের সুযোগ বৃদ্ধি, বাংলা ফসল বীমা যোজনা, কৃষক-ক্রেডিট কার্ড, কৃষি ঋণের সুবিধা, নানা ভর্তুকিযুক্ত যন্ত্রপাতি-ক্রয়ের ও ভাড়ার সুবিধা, চাতাল তৈরি, গোলাঘর তৈরির সুবিধা, ঋণ—কৃষকের অবস্থার পরিবর্তন এনেছে। ন্যায্য মূল্যে ধান বিক্রি করে চেকের মাধ্যমে টাকা দেওয়ার ফলে ধানের অভাবী বিক্রি বন্ধ করার উদ্যোগ এখন অনেকটা সাফল্য পেয়েছে ফলে একশ্রেণির মানুষ যারা এক্ষেত্রে অব্যবস্থা তৈরি করে কৃষকের ও ক্রেতার ক্ষতি করতো সেটা কমানো সম্ভব হচ্ছে।

রাজ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটায় এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায়, কৃষিতে যুক্ত নতুন প্রজন্ম আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে আগ্রহী হচ্ছে। বিজ্ঞানের নানা শাখার গবেষণার সুফল বাংলার কৃষিকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা এনে দেবার ভাবনা আজ আর সুদূরপ্রসারী নয়।

আধুনিক প্রযুক্তি-ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে যাবে বাংলার কৃষের শ্রমসাধ্য উৎপন্ন দ্রব্য।

বাংলার মানুষের কাছে এই আশার উচ্চারণ পৌঁছে দিতে হবে। এই প্রেক্ষাপটেই ঘোষণা হল—'কৃষকবন্ধু'।

জাগ্রত যে বাংলা

আদিম বাংলা আজও আদিমতামাখা।
বাংলার গৌরব এইখানেই।
বহু সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বাংলা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বশ্রেষ্ঠ।

হেথায় দাঁড়ায় দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার মানুষের হৃদয়সত্যকে এইভাবেই প্রকাশ করেছেন।

নবজাগরণের বাংলা জেগে উঠেছে মানবতার জয়গান গেয়ে। কিন্তু এর বীজ যে বাংলার মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে ছিল সেই সত্যতা ধরা পড়ল নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে চর্যাপদের পুঁথির আবিষ্কারে। ধরা পড়ল নানা প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের তথ্যে।

চর্যাপদ আজ বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যের আদিম রূপ হিসেবে স্বীকৃত। এখানে ধরা পড়েছে সমসাময়িক প্রান্তিক বাংলার জীবনকথা। দুঃখময় জগৎ, মায়ার সংসার অতিক্রম করে প্রকৃত জীবন ও জগৎ সত্যের পথে এগিয়ে চলে। এ কথাই বলা হয়েছে চর্যাপদে। এই পথই সকল মানুষের পথ। দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে, এই জীবনদর্শন মানব ইতিহাসের মহামূল্যবান ধারাকে আজও পুষ্ট করে চলেছে।

ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির বহুত্ব বাংলার প্রাণভোমরা। তাই বাংলার মানুষ বিশ্বের মানুষের কাছে 'বিশিষ্ট' হয়ে ওঠে। সদ্য সমাপ্ত বিশ্ববাংলা শিল্পসম্মেলনের মঞ্চে উঠে প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিরাই বিশেষভাবে বললেন 'বাংলার মানুষ'-এর কথা। হৃদয় শুধু দুলে ওঠে না, ফুলেও ওঠে আমাদের। মানবতার বাংলায় বাংলার মানুষের এই যে বিশ্বস্বীকৃতি, এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আর কী হতে পারে।

বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে তাঁদের জানাই কৃতজ্ঞতা। গৌরবময় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-অর্থনীতির ধারার আমরা উত্তরসূরি, প্রণাম আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে। বাংলার এই মিশ্র-সংস্কৃতির পুরোধা যাঁরা, তাঁরা সততই বাংলাকে বিশ্বের আঙিনায়

NIVEDITA BHAVAN
INAUGURATED BY
MAMATA BANERJEE
HON'BLE CHIEF MINISTER, WEST BENGAL
IN AUGUST PRESENCE OF
MOST REVERED SRIMAT SWAMI SMARANANANDAJI MAHARAJ
PRESIDENT
RAMAKRISHNA MATH AND RAMAKRISHNA MISSION, BELUR MATH
ON
11 SEPTEMBER 2018
IN COMMEMORATION OF
THE 150TH BIRTH ANNIVERSARY OF SISTER NIVEDITA
&
THE 125TH ANNIVERSARY OF SWAMI VIVEKANANDA'S CHICAGO ADDRESSES

SW. SUVIRANANDA

জাগিয়ে রেখেছেন অনুক্ষণ, তাঁদের কর্মকাণ্ডের স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন আমাদের প্রধানতম কর্তব্য।

সরকারি উদ্যোগে এবং পৃষ্ঠপোষণায় গত সাড়ে সাত বছরে অবিচ্ছিন্নভাবে, অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলছে এই কাজ।

বাংলা মহামানবের তীর্থ। এই মহামানবেরা বাংলার পবিত্র ভূমিকে যুগে যুগে স্বর্ণফসলা করে রেখেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১২৫ বছর আগে শিকাগোর বিশ্বধর্ম সভায় ভারতবর্ষের 'মানবধর্ম'-কে আধুনিক পৃথিবীর কাছে রাজভাষায় তুলে ধরে ছিলেন। বাংলার এই বিশ্ববিজয়কে স্মরণ করে একগুচ্ছ নিবন্ধে প্রকাশিত হল একটি ক্রোড়পত্র।

ছবি: অশোক মজুমদার

দীপাবলীর উপহার

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াকের সূচনা

দীপাবলীতে রাজ্যবাসীর জন্য সুখবর।

৫ নভেম্বর দক্ষিণেশ্বরে অত্যাধুনিক আকাশপথের উদ্‌বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই স্কাইওয়াক অর্থাৎ আকাশপথে পূণ্যার্থীরা যানজট এড়িয়ে দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে সরাসরি মন্দিরের কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন।

এই অত্যাধুনিক স্কাইওয়াকটি সাড়ে ১০ মিটার চওড়া ও ৩৪০ মিটার দীর্ঘ। কাচ ও ইস্পাত দিয়ে তৈরি এই স্কাইওয়াকটি দক্ষিণেশ্বর রেল স্টেশন থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এলইডি আলো দ্বারা সজ্জিত, সিসিটিভি মনিটরিং সমৃদ্ধ এবং এই ক্যান্টিলিভার ব্রিজটি অগ্নি প্রতিরোধকারী ক্ষমতাবিশিষ্ট। রেলওয়ে ও মেট্রো স্টেশন থেকে সরাসরি এবং পাশাপাশি রামকৃষ্ণ পরমহংস রোড থেকে মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে। এই স্কাইওয়াক বরাবর দুধারে থাকছে মোট ১৪টি চলমান সিঁড়ি, চারটি লিফট এবং আটটি সিঁড়ি। এর ফলে, সাধারণ মানুষ যে কোনও জায়গা থেকে স্কাইওয়াকে উঠতে ও নামতে পারবেন। প্রতিটি লিফটে একবারে ২০ জন মানুষ ওঠানামা করতে পারবেন। বিনামূল্যে হকারদের পুনর্বাসনের জন্য ১৩৭টি দোকান ও ইউটিলিটি রুমসমৃদ্ধ ব্রিজটি পথচারী ও যানচলাচলের রাস্তাকে পৃথক করেছে। প্রতি বছর এই মন্দিরে আসেন ১.৪ কোটি দর্শনার্থী। যাঁরা পায়ে হেঁটে মন্দিরে যান, তাঁদের জন্য এই স্কাইওয়াক খুব উপযোগী হবে। এর ফলে ওই রাস্তার ট্রাফিক সমস্যারও সমাধান হবে। রাজ্যের অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মতো এই স্কাইওয়াকের পরিকল্পনাও মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত। স্কাইওয়াকের নীচে রানী রাসমণি রোডেরও আধুনিকীকরণ হয়েছে। পথচারীদের জন্য দু'দিকে দু'টি রাস্তা তৈরি হয়েছে। মাঝখানে রয়েছে ৫.৬৫ মিটার চওড়া বিটুমিনাসের রাস্তা, গাড়ি চলাচলের জন্য।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ থেকে এই স্কাইওয়াকের নাম হল দক্ষিণেশ্বর রানী রাসমণি স্কাইওয়াক। দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে যদি রানী রাসমণির নাম না থাকে তাহলে ইতিহাস অধরা থেকে যাবে। দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় আন্তর্জাতিক ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র। দক্ষিণেশ্বর এলাকা খুব ঘনবসতিপূর্ণ। আমার হকার ভাইবোনদেরও পুনর্বাসিত করা দরকার। তাই আমরা এই স্কাইওয়াক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

এই কাজটির জন্য আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই করতে হয়েছে আমাদের। এটা মানুষের কাজে লাগবে, পুণ্যার্থীরা এর মাধ্যমে অনেক উপকৃত হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে রেপ্লিকা স্টেশন তৈরি করা হয়েছিল। তারাপীঠে, কামাক্ষ্যাতেও রেপ্লিকা স্টেশন করা হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরকে দমদমের সাথে সংযুক্ত করার জন্য নোয়াপাড়া পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হয়েছিল। বেলুড় মঠে কার পার্কিং সেন্টার তৈরি হয়েছিল। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসবে, তাই জায়গাটা আমাদের পরিষ্কার রাখতে হবে। দক্ষিণেশ্বর ট্রাস্ট কমিটি এটা রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সাধারণ মানুষকেও অনুরোধ করব তারাও যেন এটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। দিনে দু'বার করে কামারহাটি পুরসভা এটি পরিষ্কার করবে।

আমরা কালীঘাটেও একটি স্কাইওয়াক তৈরির পরিকল্পনা করছি। ইতিমধ্যেই কালীঘাটের জন্য আমরা একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছি। আমরা তারাপীঠ, সতীপীঠ, কঙ্কালীতলা, বক্রেশ্বর, নলহাটেশ্বরী, ফুরফুরা শরিফ, তারকেশ্বর, গঙ্গাসাগর—সব কিছুর উন্নয়ন করেছি। ধর্ম যার যার নিজের। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি। আসলে মনটা সাধু হওয়া চাই। আমাদের ভারতবর্ষ অনেক বড়। এক এক রাজ্যের এক এক রকম সংস্কৃতি। আমাদের ধর্ম এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়-এটাই হিন্দুধর্মের বিশিষ্টতা। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমরা সকলে ঈদ, বড়দিন, গুরু নানক জয়ন্তী, দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, যত মত তত পথ। মানব শরীর কি কোনও অঙ্গ ছাড়া সম্পূর্ণ হয়? একটি পরিবারেও অনেক সদস্য থাকেন। সমস্ত ধর্মের মানুষকে নিয়েই সমাজ তৈরি হয়।

এই স্কাইওয়াক শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের জন্য একটা মডেল। ধর্মীয় স্থানে ভিড় এড়াতে এই স্কাইওয়াক তৈরি করে যানজট কমানো সম্ভব। দক্ষিণেশ্বরে একটি পূর্ণাঙ্গ থানা হওয়া প্রয়োজন। রানী রাসমণি অনেক লড়াই করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। তাঁর নামে আরও কিছু করতে চাই।

প্রতিবেদন: রাতুল দত্ত
ছবি: অশোক মজুমদার

যত মত তত পথ

(১)

জাগানিয়া গানে তিনি এলেন ঘুম ভাঙাতে। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস।

দক্ষিণেশ্বরেই চলল তাঁর সাধনপর্ব। নতুন ধর্ম বা নতুন সম্প্রদায় নয়। আধুনিকতম ভাবনার প্রকাশ ঘটালেন। বললেন—যত মত তত পথ। একে শুধু ধর্ম-সমন্বয় বলা যায় না। প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলিকে আচরণ করলেন তিনি। বুঝলেন—সবই এক বিন্দুতে মিশেছে।

আরও বুঝলেন—প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ধর্ম আলাদা আলাদা তাই তাঁদের মতও ভিন্ন। পথও ভিন্ন। ব্যক্তিস্বাধীনতার ময়ূরঝরনা যেন। সবকটি দরজা খুলে গেল।

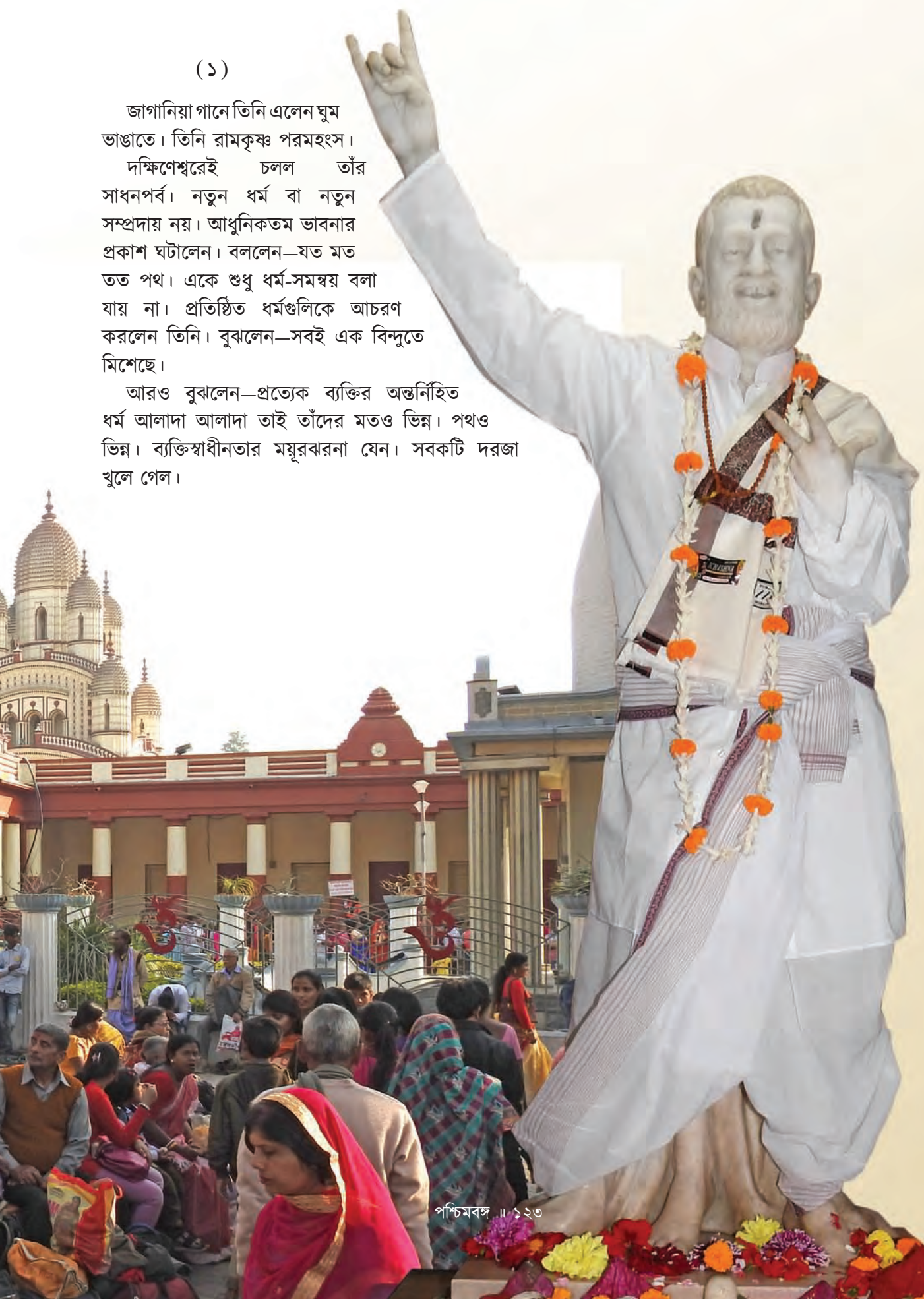

কামারপুকুরের গদাই দাদার সঙ্গে এলেন দক্ষিণেশ্বর। মূর্তি প্রতিষ্ঠার রাজকীয় উৎসবে তিনি প্রায় অভুক্তই থেকে গেলেন। জাতপাতের বেড়ায় তখন তিনি আটকে। চাল কলা বাঁধা পূজারী তিনি হবেন না, তবু দায় এড়াতে পারলেন না। আচার-সর্বস্বতা তাঁকে গ্রাস করতে পারল না।

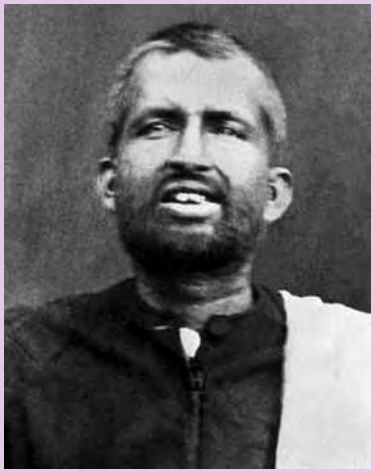

সহজ করে বললেন সবচেয়ে শক্ত কথাটা। মানুষই ঈশ্বর। বললেন—আমি তো পেরেছি। তোরা কেন পারবি না? সত্যিই তো তুমি পেরেছো পরমহংসদেব। সকলের ঘরে ঘরে তুমি পুজো পাচ্ছ। দিকে দিকে তোমার মন্দির। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশি চেয়েছিলেন তিনি। জনে জনে ডেকে ডেকে 'লোকশিক্ষে' দিতে চেয়েছেন।

প্রেমের নতুন ঘরানা তৈরি হল। দয়া নয় প্রেম। ঈশ্বর বাঁধা পড়লেন প্রেমে। জীবে দয়া নয়। শিব জ্ঞানে জীব সেবা—এটাই মূলকথা। শিব মানে সত্য, সুন্দর, ঈশ্বর। গৃহী মানুষের কল্যাণে সকলের কাছে এই মন্ত্রই দিলেন তিনি। গড়ে নাও সুন্দর, নির্লোভ, পবিত্র জীবন। সংসার ত্যাগ করে নয়, সংসারের মধ্যেই সুন্দরতম জীবনের স্বাদ কিভাবে পাওয়া যায়া তারই কথা বলে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে বসে বসে।

তাঁর কাছে আসতেন নানা মতের নানা পথের মানুষ। তাঁদের বিশ্বাসও পাল্টে যেতে লাগল।

নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের দর্শনের আশায় একদিন নানা ঘাট ঘুরে তরী ভিড়ালেন রামকৃষ্ণ ঘাটে। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ—কেবলই খোঁজা। তবু ঈশ্বরের খোঁজ মেলে না। লোকটাকে বিশ্বাস করতেও পারে না নরেন। কিন্তু চলে যেতেও

পারে না। কে যেন বেঁধে রেখেছে। বেঁধে বেঁধে রেখেছে। সেই বাঁধনের দড়ি অন্তহীন। অদৃশ্য অথচ দৃশ্যমান। সর্ব জীবে প্রেম, কারণ তিনি সবকিছুতে আছেন।

ধীরে ধীরে পাল্টে গেলেন নরেন্দ্রনাথও। যত মত তত পথ—এই বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন পৃথিবীব্যাপী।

বিশ্বে হাঁক-ডাক করে তিনি শোনালেন—ভেঙে ফেল সব পাঁচিল। সব বেড়া। মানুষের মুক্ততীর্থ এই পৃথিবী।

দূর হোক সব অসাম্য।

দরিদ্রহীন পৃথিবীর ভাবনায় মেতে উঠলেন। মাতিয়ে তুললেন।

মুছে ফেল নারী-পুরুষের ভেদ। নারীশক্তির উত্থান ও বিকাশ তাঁর মন জুড়ে। পৃথিবীর নানা দেশে স্বাধীন, শিক্ষিত নারীকে দেখে তাঁর হৃদয় যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

ভারতীয় নারীর জীবন অন্ধকার কোণ থেকে মুক্তি পাক। জেগে উঠুক তাঁর ভেতরের ঈশ্বর।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে দিয়ে তাঁর প্রার্থিত সব কাজই করিয়ে নিয়েছেন। বিবেকানন্দও তেমন কাউকে খুঁজছিলেন যাঁকে দিয়ে তাঁর স্বপ্নপূরণ হবে। পেয়ে গেলেন এক খাপ খোলা তলোয়ার। মিস মার্গারেট।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনাকে রূপ দিলেন কাজে। বিরামহীন তাঁর কাজ। প্রায় ১৩টি বছরে তিনি একটি গভীর খাত কেটে গেছেন। গুরু-শিষ্য-পরম্পরার সেই দড়িতে সেবারও যে কত পর্দা থাকে!

এই ১৩ বছরে তিনি যা করেছেন তার প্রেরণা বিবেকবাণী। বিবেকানন্দ যা করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা সেখানেই আত্মমগ্ন হয়েছেন। বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম নিবেদিতার 'ভারতপ্রেম'-এর মধ্যে ডানা মেলে ছিল।

বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতের মানবধর্মকে। পরাধীন ভারতের কাছে তাঁর বাণী—জাগো আরও একবার।

অতীত-ঐতিহ্যের উদ্ধার করলেন। এই উদ্ধারের ধারাবাহিকতার কাজ চালিয়ে গেলেন নিবেদিতা। ছড়িয়ে দিলেন আরও অনেকের মধ্যে।

বিবেকানন্দ ভারতের আধ্যাত্মিকতার জয় প্রতিষ্ঠা করে এলেন বিশ্বের দরবারে। নিবেদিতা এই কাজকে আরও প্রসারিত করলেন।

নিবেদিতার ভারতে আসার চার বছরের মধ্যে চলে

গেলেন বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ-ঘাটে এসে ভেড়া তরী তখন বিশাল জাহাজ। সেই জাহাজের অন্যতম কাণ্ডারী নিবেদিতা। দেশে। বিদেশে।

১৩ বছরের এক ক্লান্তিহীন সংগ্রামীর জীবন যা আমাদের বিস্মিত করে, আমাদের হৃদয়কে আজও আবেগঘন করে তোলে।

(২)

স্বামীজিকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন নিবেদিতা। বুঝেছিলেন ভেতর থেকে। গ্রহণ করেছিলেন যতটুকু যেভাবে পারা যায়। তাই তাঁর লেখায় বিবেকানন্দ উন্মোচিত হন অসাধারণভাবে। তিনি লিখছেন— আমরা এমন এক প্রেম দেখিয়াছি যাহা দীনতম এবং অজ্ঞতমের সহিত এক হইয়া যাইত; তাঁহার চক্ষু দিয়া মুহূর্তের জন্যও জগৎ দেখিয়া মনে হইত সমালোচনার কিছু নাই; হাসিতাম, আমরা বীরত্বের অগ্নিতে নিজেদের উদ্দীপিত করিতাম এবং দেবশিশুর প্রবোধনের সময় যেন আমরা উপস্থিত থাকিতাম।

[Notes of Some wanderings with the Swami Vivekananda—Sister Nivedita, utbodhan office, Calcutta, Fifth edition (1967) P-1]

বিবেকানন্দের দীনতা, ত্যাগ ও প্রেম সম্পর্কে নিবেদিতার মূল্যায়ন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের জীবনের আচরণের মধ্যে দিয়েই মানুষের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। চিনে নেওয়া যায়, বুঝে নেওয়া যায় পাশের মানুষটিকে এবং নিজেকেও। বিবেকানন্দ এসব ক্ষেত্রেও সমস্ত হীনতা ও ক্ষুদ্রতার অনেক উপরে ছিলেন। ব্যক্তি বিবেকানন্দকে এভাবেই দেখেছিলেন নিবেদিতা।

বিবেকানন্দ ছিলেন কর্মযোগী। কাজই তাঁর কাছে প্রধান। যে কোনও ধরনের নিষ্ক্রিয়তার তিনি ছিলেন বিরোধী। তাঁর এই পৌরষ ও প্রেমের উৎস রামকৃষ্ণদেব। নিবেদিতার গুরু বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিকতার মূলকেন্দ্র হিসেবে দেখেছিলেন। সমগ্র বিশ্বরক্ষার প্রয়োজনেই ভারতের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন— এই গভীর বিশ্বাসে তিনি বলেছেন—'উঠ ভারত, সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জয় করো।' 'সত্যই আমার ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্ব আমার দেশ'—তাঁর এই কথা তাঁর জীবন ও কর্মকে যে ব্যাপ্তি দিয়েছিল সেকথা নানাভাবে আমরা জানতে পারি।

কিন্তু নিজেকে, নিজের উদ্দেশ্য ও কাজকে যেভাবে বিবেকানন্দ সোচ্চারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার জন্য দরকার ছিল বুক ভরা সাহস ও আত্মপ্রত্যয়। তিনিই বলেছেন যে, আত্মপ্রত্যয় আমরা পেয়েছি পাশ্চাত্য থেকে। এটি একটি মহৎ গুণ। সাহসটা পেয়েছিলেন ভেতর থেকে। নিজেকে চিনতেন। বুঝতেন। নিজের শক্তির প্রতি ছিল সমীহ ও শ্রদ্ধা। নিজেকে এবং বিশ্বকে ভালবাসতেন। তাই আত্মপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম তথা

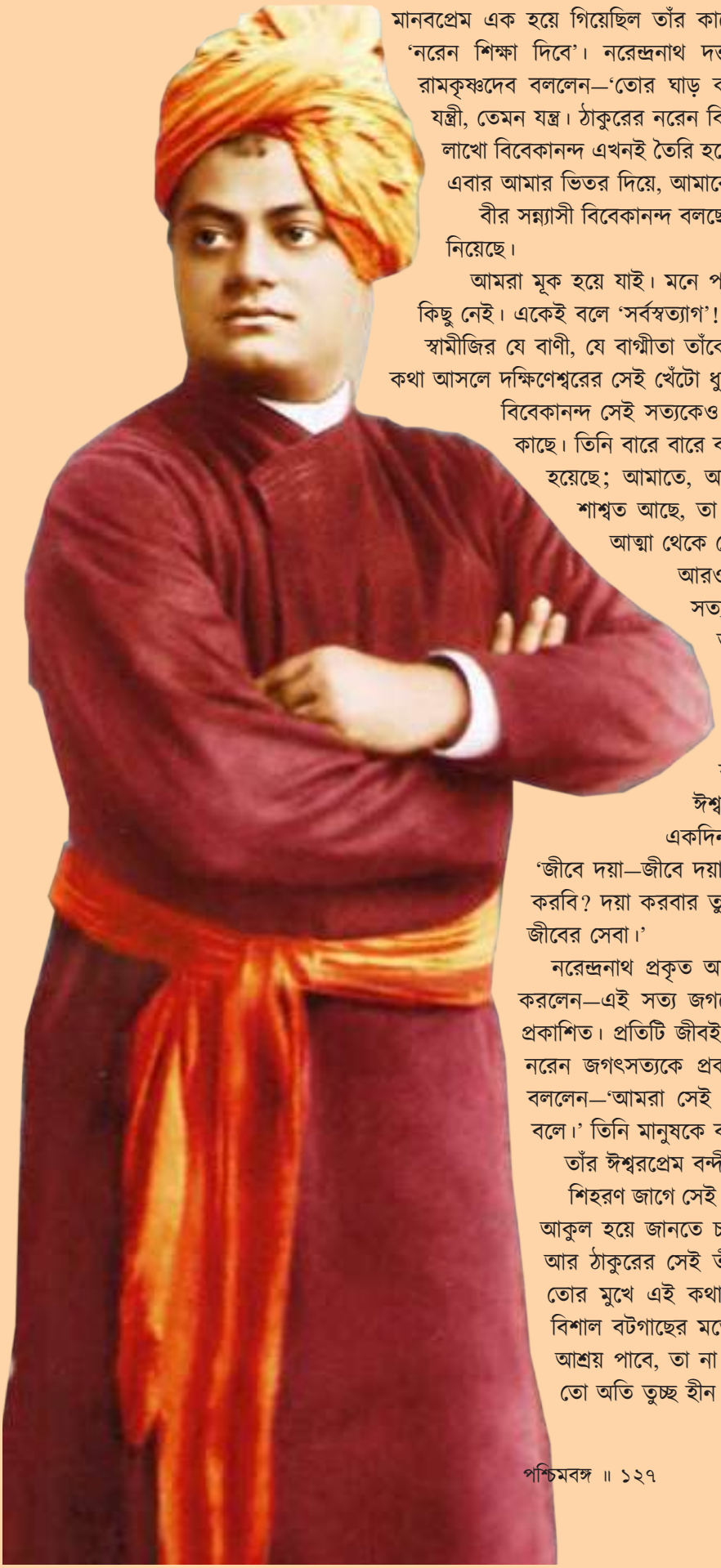

মানবপ্রেম এক হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। সর্বত্যাগী গুরুদেব তাঁকে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষা দিবে'। নরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন—'আমি, ওসব পারব না'। রামকৃষ্ণদেব বললেন—'তোর ঘাড় করবে।' যেমন গুরু, তেমন শিষ্য। যেমন যন্ত্রী, তেমন যন্ত্র। ঠাকুরের নরেন বিবেকানন্দ হয়ে বললেন—'তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনই তৈরি হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন।'

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলছেন—এ জন্ম এ শরীর সেই মুর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।

আমরা মূক হয়ে যাই। মনে পড়ে যায়, তাঁর উজ্জ্বল চোখদুটি। তাঁর আর কিছু নেই। একেই বলে 'সর্বস্বত্যাগ'! একেই বলে 'আত্মনিবেদন'!

স্বামীজির যে বাণী, যে বাগ্মীতা তাঁকে ও ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠত্বে আসীন করে সে কথা আসলে দক্ষিণেশ্বরের সেই খেঁটো ধুতি পড়া পুরোহিতের।

বিবেকানন্দ সেই সত্যকেও বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করে গিয়েছেন বিশ্বের কাছে। তিনি বারে বারে বলেছেন—আমি যা তা সর্বদা তাঁরই কল্যাণে হয়েছে; আমাতে, আমার কথাতে যা কিছু মঙ্গলময়, সত্য বা শাশ্বত আছে, তা আমি তাঁরই শ্রীবদন, তাঁরই হৃদয়, তাঁরই আত্মা থেকে পেয়েছি।

আরও বলেছেন—যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের—আর ভুলভ্রান্তিগুলি আমার।

ঈশ্বরের খোঁজে ছুটে যাওয়া নরেন শেষদিন পর্যন্ত একই কথা বলে গেছেন রামকৃষ্ণদেবকে। তাঁর চাক্ষুস প্রমাণ চাই ঈশ্বরের।

একদিন সমাধিস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা। কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত আলো দেখতে পেলেন। মনে মনে অঙ্গীকার করলেন—এই সত্য জগতে প্রচার করব। এই জীবজগতেই ঈশ্বর প্রকাশিত। প্রতিটি জীবই আসলে 'শিব'। ছোটো থেকে শিবের ভক্ত নরেন জগৎসত্যকে প্রকাশের সংকল্প করলেন। বিবেকানন্দ হয়ে বললেন—'আমরা সেই ভগবানেরই সেবক যাদের অজ্ঞেরা মানুষ বলে।' তিনি মানুষকে বললেন—'নরনারায়ণ'।

তাঁর ঈশ্বরপ্রেম বন্দী হল মানবপ্রেমে। নরনারায়ণের প্রেমে।

শিহরণ জাগে সেই মুহূর্তটার কথা ভাবলে, যখন ঠাকুরের কাছে আকুল হয়ে জানতে চাইছে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকার পথ আর ঠাকুরের সেই তীব্র ধিক্কার—ছি ছি তুই এতবড়ো আধার। তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিসনি।

ভেবে নিতে কষ্ট হয় না তখন নরেনের মনের, মুখের অবস্থা কি। সারাজীবনেও এই মুহূর্তটি তিনি ভোলেননি নিশ্চয়ই।

গুরুদেবকে দেখেছেন নরেন্দ্রনাথ। গলায় অসহ্য কষ্ট। ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। বারণ মানছেন না। বলছেন—কি! দেহের কষ্ট!..... যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।

এরই প্রতিধ্বনি শুনি বিবেকানন্দের কণ্ঠেও। নির্বিকল্প সমাধি নয়, তিনি হাজার বার জন্মাতে চাইছেন। বলছেন—'..... আমায় যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেব। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব।'

ঠাকুর তো বলেই ছিলেন নরেনকে—

'তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি ওটাও আমি।'

স্বামীজি বলতেন—আমি দেহহীন এক কণ্ঠস্বর।

স্বামীজির প্রচারিত 'ভাব' বিদেশ থেকে আনা বলে কোনও গুরুভাই প্রশ্ন তুলেছিলেন, উত্তরে স্বামীজি বলেন—'তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বন্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।'

তিনি বিশ্বাস করতেন—'ঠাকুরের মতো এমন পুরুষোত্তম জগতে এর আগে আর কখনও আসেননি।'

বিশ্বাস করতেন যে তাঁর এবং তাঁর গুরুভাইদের জন্ম হয়েছে ঠাকুরের ভাব জগতে ছড়িয়ে দিতে।

পাশ্চাত্যে থাকার সময় তিনি প্রায়ই দিনে বারো-চোদ্দটা বক্তৃতা করতেন। নিঃশেষ হয়ে যেত তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার। বিষয় খুঁজে পেতেন না। ক্লান্ত-তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবেকানন্দের পাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বক্তৃতা দিয়ে চলতেন। পরদিন তিনি সেই ভাবই প্রকাশ করতেন। তিনি যা বলে যেতেন নিজেই অবাক হতেন। কখনও তিনি এসব ভাবেনইনি। তাঁর গভীর প্রতীতি জন্মালো যে শ্রীরামকৃষ্ণই একথা শোনাচ্ছেন, বলাচ্ছেন।

মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা তারই বিকাশ ঘটাতে হবে। শুধু দৈহিক নয়, মানসিক উৎকর্ষের ওপর তিনি জোর দিতেন। এই মনের সম্পদকেই তিনি 'দেবত্ব' বলছেন। এই মন-সম্পদের বৃহত্তম রূপই 'ঈশ্বর' বলে তিনি মনে করতেন। এরই চরম বিকাশ 'ঈশ্বরলাভ'। যা তিনি তার গুরুদেবের মধ্যে দেখেছিলেন। 'ধর্ম' এই বিকাশে সহায়তা করে। দেহের জন্য বিজ্ঞান এবং মনের জন্য ধর্ম—একই সত্যের দুপিঠ। এই দুই-এর সমন্বয় করতে পারলেই মানবমুক্তি সম্ভব। এই তাঁর মত।

তবে সেই মুক্তির মানে আলাদা।

বিবেকানন্দের ভাবে ও ভাষায়—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর

শ্রীরামকৃষ্ণ মানবকল্যাণের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই আদর্শেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'মুচি মেথর আমার রক্ত, আমার ভাই।' বলেছিলেন—একটি কুকুরও যতক্ষণ অভুক্ত থাকবে ততক্ষণ তাঁকে খাওয়ানো তাঁর ধর্ম।

এইভাবেই তিনি জীবকে শিব করে তুলতেন। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'তোদের চৈতন্য হোক।' নরেনের মধ্যে দিয়েই তিনি এই চৈতন্য জাগানিয়ার কাজটি করলেন। এই জন্যেই তাঁর বিবেকযন্ত্রের প্রয়োজন ছিল।

নানা ধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন— সবার মধ্যে এক ঈশ্বর। ঈশ্বরের ভুবনময়তার সত্য জনে জনে ডেকে ডেকে বলতেন দক্ষিণেশ্বর থেকে।

আর বিবেকানন্দ বলতেন—'আমি যতটা ভারতবর্ষের ততটা বিশ্বের— এ বিষয়ে ছলনার প্রয়োজন নাই।... কোন দেশের আমার উপর কোন বিশেষ অধিকার নাই। আমি কি কোন জাতিবিশেষের ক্রীতদাস?'

রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ বিশ্বব্যাপী মানবধর্মের এই কাজে সকলকে আহ্বান জানালেন। তাঁর 'ভাই ও ভগিনীদের' ডাকলেন। সেই ডাকে সারা দিয়ে এগিয়ে এলেন মিস মার্গারেট। হয়ে উঠলেন 'বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। এ কথা আমাদের সকলের জানা। কিন্তু তিনি নিজেই নিজেকে, আখ্যা দিয়েছেন—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের স্ত্রী-কে পুজো করেছিলেন। নারীর মধ্যে যে শক্তি তাঁরই স্বীকৃতি দিলেন। সেই সময় সমাজে নারীর স্থান ছিল অন্ধকারময়। তিনিই প্রমাণ করলেন—নারীও পূজার যোগ্য। নরকের দ্বার নয়। হয়ে উঠতে পারেন প্রকৃত সহধর্মিণী। শুধুমাত্র পুত্রের জন্মদানের জন্য তাঁর জীবন নয়। তিনি 'সংঘজননী' হতে পারেন।

নারীর এই যে উত্তরণ—সেটা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় হল।

বিবেকানন্দ বললেন—ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা। পরাধীন দেশে কল্যাণের জন্য তিনি দুটো কাজের কথা ভেবেছিলেন। 'মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে (জনসাধারণকে) জাগাতে হবে।' দুটোরই পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ।

মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজেদের পছন্দমতো পথ বেছে নেওয়ার কথা বিবেকানন্দ ভাবতেন। তাঁদের 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ' করার ক্ষমতার উপর তিনি জোর দিতেন। আধুনিক ভারতের নির্মাণে তাঁর এই 'নারী-জাগরণ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বললেন: 'জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।' তিনি বলছেন: 'তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা নয়; কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ কর—ইহার অর্থ কি?...সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্তুতেই, জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর।' স্বামীজীর মতে, ইহাই বেদান্তের শিক্ষা—সর্ববস্তুতে ঈশ্বরদর্শন।

তিনি কর্মযোগের সঙ্গে ধ্যানযোগ এক করে দিয়েছিলেন। ধ্যানের দৃষ্টিতেই ভারতে কর্মের মধ্য দিয়ে মানবমুক্তি চেয়েছিলেন। লোকাচারকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন অবলীলায়। বলেছিলেন—পৃথিবীতে এখন তৃতীয় যুগ চলছে বৈশ্যশ্রেণীর প্রভুত্বে। চতুর্থ যুগ আসবে শুদ্রদের প্রভুত্ব নিয়ে।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় গিয়েছিলেন। একদল যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি তাঁদের বলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়তে। বলেন জন্মভূমির সেবাই তাঁদের প্রধান কাজ। বলেন—'সর্বাগ্রে চাই রাজনীতিক স্বাধীনতা।' কিন্তু ভিক্ষাপত্র হাতে নিয়ে আবেদন নিবেদনের পথকে

তিনি মেনে নিতে পারেননি। চেয়েছিলেন—*বিবেকের জাগরণ*। সমস্ত দুর্বলতা, কাপুরুষতা থেকে মুক্ত হয়ে এগিয়ে আসতে। বলেছিলেন— *হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত'*। আমরা দেখেছি পরবর্তীকালে নিবেদিতা এই পথেই হেঁটেছেন।

ভারতবর্ষের লোকেদের মধ্যে একতা ও স্বজনপ্রীতির অভাব দেখে তিনি কাতর হয়েছেন। ভারতীয় নেতাদের মধ্যে দাস মনোভাব দেখে গর্জে উঠেছেন। বলেছেন— *আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোনও ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত...।*

এ প্রসঙ্গে **'স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা'** শীর্ষক একটি প্রবন্ধে দিলীপকুমার রায়-এর একটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে—

এ-সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি আজও মনে জেগে আছে, থাকবেও চিরদিন। স্মৃতিটি রবীন্দ্রনাথের একটি দীপ্ত উক্তির—আমার 'স্মৃতিচারণ' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে ফলিয়েই লিখেছি। তাই শুধু শেষটুকু উদ্ধৃত করি—যেটুকুতে স্বামীজীর কথা বলেছিলেন তিনি লন্ডনে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে। বলেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে লন্ডনে সভা ডাকা সম্পর্কেঃ দিলীপ, আমরা এ স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জা হীনতা ভীরুতা প্রচার করে এদের আদর কাড়তে ছুটব ? এ হয় কখনও ? এরা আর যাই পারুক না কেন কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না—নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাইতো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদেশে এসে এদের ডাক দিয়েছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বলে—কাঁদুনি গাননি আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কিভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্য কীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেননি—আমরা বড় আর্ত, দীনহীন, কৃপার পাত্র। বলতেনঃ 'ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও—তার বাইরের দারিদ্রকেই বড় করে দেখো না।' আমেরিকার সামনে তিনি মাথা উঁচু করেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের মহিমার কথা—যদি

কেঁদে ভাসাতেন 'দুটি ভিক্ষে পাই গো' বলে, তাহলে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।

বিবেকানন্দ ভবিষ্যৎ ভারতকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং দলিত জনগণের পুনরুজ্জীবনের ওপর গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ধর্মে এতটুকুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি।

তাঁর সমাজ-পরিকল্পনায় জোর দিয়েছিলেন নিম্নশ্রেণির উন্নয়নে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারা যুবকদের উপর।

১৮৯৫-র একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—*এখন আমি চাই—একদল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারক।* আমরা দেখলাম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত নিবেদিতাকে ও তাঁর কাজকে।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের নিয়ে স্বামীজি গড়ে তুললেন বেলুড় মঠ। মঠের, সহযোগী রূপে গড়ে তুললেন 'মিশন'। দুটিই গুরুদেব রামকৃষ্ণের নামে।

৯ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে আলমোড়া থেকে মিস মেরী হেলকে তিনি লিখছেন : *'কেবল একটা ভাব আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে-বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরা-আক্রান্ত*

"পারিয়া"র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে—প্রভু আমাকে সাহায্য করছেন, তাদেরও সাহায্য পাঠাচ্ছেন ! মানুষের কথা আমি গ্রাহ্য করি ? ... আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ প্রবলভাবে চালু হয়ে গেছে ; আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্তত: ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমবো। আর নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান—একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি ; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।'

(৩)

বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন বিবেকানন্দ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর নুতন ধারা তৈরি করেছিলেন যে ধারা প্রবল বেগে ভারতের মাটিতে বইয়ে দিলেন নিবেদিতা।

এই প্রসঙ্গেই দেখব বিবেকানন্দের বিকাশ রেখার কয়েকটি দিক।

বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-এর থেকে জানা যাচ্ছে যে বিবেকানন্দ পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই তাঁর শিল্পবোধ অর্জন করেছেন। আর এক ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—'দাদা অর্থাৎ স্বামীজী বাল্যকালে ছবি আঁকিতেন। তখন চার আনায় এক বাক্স জলরঙ পাওয়া যাইত। তাহার সাহায্যে তিনি রঙীন ছবি আঁকিতেন।'

শিল্পতত্ত্বে বিশেষ পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্পর্কে ছিল তাঁর গভীর পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনা। বই-পড়া জ্ঞান নয়, সারা ভারত ঘুরে ঘুরে তিনি এই জ্ঞান আহরণ করেন।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কে নিবেদিতাকে একটি বক্তৃতা করতে উৎসাহিত করেন। বিষয়—Fine Arts of Ancient India.

শিল্প সম্পর্কে তাঁর প্রজ্ঞার অসাধারণত্ব তাঁর কথাতেই শোনা যাক।

খাঁটি শিল্পকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। পদ্মের মতোই তা মাটি থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে উপরের দিকে পাপড়ি মেলে ধরে। বলছেন— *শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে, প্রকৃতিকে অতিক্রমও করতে হবে। শিল্পের গভীর তত্ত্ব তিনি নানাভাবেই বুঝিয়েছেন নিবেদিতাকে।*

নন্দলাল বসুর থেকে জানা গেছে 'ভারতীয় চারুকলা'-কে নিবেদিতা কিভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। বিবেকানন্দের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিবেদিতা ভারতীয় চারুকলার আধ্যাত্মিক মাধুর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং নন্দলাল বসু প্রমুখ ভারতীয় শিল্পী ও ই.বি. হ্যাভেল নিবেদিতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

স্বামীজি অসাধারণ বাগ্মীতার প্রমাণ রাখলেন বিশ্বধর্মসম্মেলনে। বিদেশি ভাষাতে যেভাবে ভাবনার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার করলেন সেই ঐশ্বরিকতায় মুগ্ধ হলেন সেদেশের মানুষ।

'নিউইয়র্ক ক্রিটিক'-এ তাঁকে বলা হল—দৈবীশক্তি-সম্পন্ন বক্তা।

তেমনই ছিল তাঁর আরেকটি প্রয়াস। চলতি বাংলা ভাষায় ভাবগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—সরলতাই রহস্য। আমার গুরুদেবের কথ্য অথচ গভীরভাবে প্রকাশক ভাষাই আমার আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথই তাঁর চলিত গদ্যরীতিকে সর্বপ্রথম মর্যাদা দিয়ে স্বামীজির 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখেন— *এমনভাব, ভাষা ও উদার মতবাদের সংমিশ্রণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধনের আদর্শবহনকারী। এ-গ্রন্থ প্রত্যেকের কাছেই এক নতুন আবিষ্কার।*

এই ভাষা ছিল তাঁর শক্তির জায়গা। পরাধীন ভারতবর্ষে নিজের মাতৃভাষার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ দক্ষতাও ছিল তাঁর করায়ত্ত।

তাঁর বক্তব্য ও লেখনী এই ভাষার অপূর্ব ব্যবহারে তাঁকে আরও শক্তি দিয়েছিল।

তাঁর অক্লান্ত জ্ঞানচর্চাও 'নূতন ভারত'কে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল। গুরুত্ব দিয়েছিলেন স্থাপত্য ও নৃতত্ব-কে। ঐতিহাসিক গবেষণার বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন যুক্তিবাদী দার্শনিক বিবেকানন্দ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন-কে নতুন দৃষ্টিকোণ-এ দেখতে শুরু করেন তিনিই। সোচ্চারে বললেন—*প্রাচীন ভারতবর্ষের সবযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়।'*

বিবেকানন্দের প্রতিদিনের জীবন ছিল তাঁর বলা 'বাণী'-র চরম প্রকাশ।

তাঁর এই প্রাত্যহিকতা আর বাণী গড়ে তুলেছিল নিবেদিতাকে, যেমন করে রামকৃষ্ণ গড়েছিলেন নরেনকে। এই গড়নে আশ্চর্য মিল। মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সিদ্ধমন্ত্র যেন।

রামকৃষ্ণ সহজ কথায় সহজ ভাবে যে কথা সকলকে বলে গিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে সে কথা বললেন, সমস্ত 'লোকাচার'-কে তুচ্ছ করলেন প্রবল বিক্রমে।

তিনি সকলকে 'ভয়শূন্য' হতে বলেছেন। 'অভীঃ' মন্ত্রে জাগাতে চেয়েছেন।

রামকৃষ্ণ-র 'মানুষই ঈশ্বর' এই সহজ তত্ত্বই তিনি জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে তাই তিনি বলছেন—

আমাদের উদ্দেশ্য জাতিবিভাগ নষ্ট করা নহে, কিন্তু ভোগাধিকারের সাম্যসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচন্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের জীবনের ব্রত।

পৌরুষে, প্রেমে, একত্বে এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় নূতন ভারত গড়ার ডাক দিয়ে সেই দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন নিবেদিতাকে।

ভারতআত্মার বাণীমূর্তি বিবেকানন্দ। নিবেদিতার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন সেই আত্মাকে।

একটি চিঠিতে, ভারতে আমার আগে মার্গারেটকে লিখছেন—

...পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় ব্যাপার অবশ্যই ধীরে ঘটে।

নিবেদিতাকে দিয়ে এক গুরু-দায়িত্ব পালন করাবেন বলেই তাঁকে রেখেছিলেন মুক্ত, স্বাধীন। এর ফলেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনের প্রকৃত কাণ্ডারী হতে পেরেছিলেন এই ভারত-হিতৈষী। প্রমাণ করে গিয়েছেন—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।

বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতে আসার আগে নানাভাবে তাঁর মন তৈরির কাজে সাহায্য করছিলেন। তাঁকে লেখা স্বামীজির বিভিন্ন চিঠিতে আমরা দেখছি... নিবেদিতাকে তিনি কিভাবে বুঝিয়েছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে কি করাতে চেয়েছিলেন, সতর্ক করেছিলেন নানাভাবে।

১৮৯৬ সালের ৭ জুন লণ্ডনে বসেই স্বামীজি নিবেদিতাকে লিখছেন—

আমার আদর্শকে বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে,—তা এই : মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের সত্য তার কাছে প্রচার করা, এবং কিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে বিকশিত করা যায়—তাই দেখিয়ে দেওয়া।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই পৃথিবী। যে উৎপীড়িত—পুরুষ বা নারী—আমার করুণা তার প্রতি। আরও অনেক করুণা করি তাকে, যে উৎপীড়নকারী।

দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে একটি ধারণা আমার কাছে—সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞান, অন্য কিছু নয়। জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের ধারা; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে! পৃথিবীতে যারা বীরোত্তম ও সর্বোত্তম, তাদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।' অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন—চরিত্র। নিঃস্বার্থ, অগ্নিজ্বলন্ত প্রেম যাঁদের মধ্যে—তাঁদের এখন জগৎ চায়। সেই প্রেম প্রতিটি উচ্চারিত শব্দকে বজ্র করে তুলবে।

***তোমার মধ্যে আছে জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি,**—এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চয়। তোমার পিছনে অন্যরাও আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী এবং তারো চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ ! ওঠ, জাগো! জগৎ যে দুঃখে পুড়ে খাক্, হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?*

১৮৯৭ সালের ২০ জুন আলমোড়া থেকে একটি চিঠিতে স্বামীজি মার্গারেটকে লিখছেন—

আমি নিজে যেভাবে শিক্ষালাভ করেছি—সেইভাবেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি, অর্থাৎ গাছের তলা আশ্রয় করে, কোনো রকমে একমুঠো খাবার জুটিয়ে নিয়ে কাজ করে যাওয়া। পরিকল্পনারও কিছু বদল হয়েছে। আমার কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি। এতে জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। যে কথা আমি চিরদিন ভেবেছি তারই প্রমাণ দেখলাম : হৃদয়, শুধু হৃদয় দিয়েই জগতের মর্মে পৌঁছান যায়। তাই বর্তমান পরিকল্পনা হল বহু যুবককে গড়ে তোলা, (উচ্চশ্রেণির মধ্য থেকে, নিম্নশ্রেণির মধ্য থেকে নয়; নিম্নশ্রেণির জন্য অল্প কিছু অপেক্ষা করতে হবে),—তারপর তাদের জনকয়েককে কোনো একটি জেলায় পাঠিয়ে দিয়ে প্রথম অভিযান শুরু করে দেওয়া। ধর্মযুদ্ধের এই অগ্রগামী কর্মী-সেনারা পথ পরিষ্কার করে ফেলার পরে তবে তত্ত্ব ও দর্শন বিস্তারের যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

জনকয়েক ছেলে ইতিমধ্যেই শিক্ষাধীনে; কিন্তু কাজের জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি আমরা পেয়েছিলাম (আলমবাজার মঠ), তা গত ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে। বাঁচোয়া যে এটি ভাড়া-বাড়ি ছিল। তবে ভাববার কিছু নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে না, কষ্টের, অসুবিধার সীমা থাকবে না,—তারি মধ্যে তো কাজ চালিয়ে যেতে হবে !... এ পর্যন্ত, মুণ্ডিত মস্তক, ছিন্ন কন্থা এবং অনিশ্চিত আহার—এই অবস্থা।

এই অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনা সারদামায়ের এই 'খুকিটির' কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল। বিবেকানন্দের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন ভারতপ্রেমের পাঠ। হাত ধরে অদ্ভুত প্রজ্ঞায় তিনি প্রিয় শিষ্যাকে তৈরি করেছিলেন। খুলে দিয়েছিলেন দেখার চোখ। শ্রদ্ধাসহকারে ভারতবর্ষের প্রতিটি জিনিসকে দেখতে হবে—শিখিয়েছিলেন সেই মন্ত্র। ভালবাসতে হবে ভারতকে, ভারতবাসীকে—এই ছিল নিবেদিতার কাছে তাঁর নির্দেশ।

১৮৯৭ সালের ২৯ জুলাই আলমোড়া থেকে স্বামীজি মার্গারেটকে লিখছেন—

দুর্ভিক্ষের কাজে এখন দারুণ ব্যস্ত। ভাবী কাজের জন্য জনকয়েক ছেলেকে তৈরি করে তোলা ছাড়া শিক্ষাদান কার্যে বেশি শক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। "খাদ্য দান" কাজটিই আমার সব শক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য টেনে নিয়েছে। কাজ যদিও এ অবধি খুবই ছোট আকারে করা গেছে, তবু ফল অপূর্ব। বুদ্ধের কালের পরে এই প্রথম দেখা গেল, অন্ত্যজ জাতির কলেরা রোগীর পাশে বসে সেবা করছে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা!

তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন আসল সিংহিনীর প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না—সেজন্য অন্য জাতির থেকে তাকে ধার করতেই হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেলটিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেই নারী—যাকে ভারতের প্রয়োজন।

কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু। এদেশে যে কী দুঃখ, কী কুসংস্কার, কী দাসত্ব—সে তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এদেশে এলে দেখবে, চারিদিকে অর্ধ-নগ্ন অগণিত নরনারী, জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে তাদের উদ্ভট ধারণা, শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে ভয়ে বা ঘৃণায়। উল্টোপক্ষে ঘৃণা পায়ও অসম্ভব। অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গরা মনে করবে, তোমার মাথা খারাপ, তোমার প্রতিটি গতিবিধি তারা সন্দেহের চোখে দেখবে।

তাছাড়া দারুণ গরম। আমাদের শীতকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমাদের গ্রীষ্মকালের মতো। দক্ষিণে তো সর্বসময় আগুনের হল্‌কা।

সহরের বাইরে ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর স্বাগত তুমি—শতবার স্বাগত! নিজের পক্ষে বলতে পারি, অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি—আমি সামান্য মানুষ, কিন্তু যেটুকু প্রভাব আমার আছে তা তোমার সাহায্যে নিয়োজিত হবে।

ঝাঁপ দেবার আগে রীতিমতো ভেবে দেখবে। কিন্তু কাজ শুরু করার পরে যদি ব্যর্থ হও, কিংবা যদি বিরাগ, বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে জেনো—আমি আমরণ তোমার পাশে আছি—তা তুমি ভারতের জন্য কাজ কর বা না কর, বেদান্ত রাখ বা না রাখ। 'মরদ্‌কী বাত হাতীকা দাঁত'—

ভারতে আসার আগে নিবেদিতা ভারতীয় অবস্থা এবং স্বামীজীর কার্যধারা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে চিঠি লেখেন। স্বামীজী শ্রীনগর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে ঐ সব প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে লিখে পাঠিয়েছিলেন। মার্গারেট নোবলের প্রশ্নধারা থেকে তিনি কতখানি যাচিয়ে বিচার করে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন বোঝা যায়, এবং স্বামীজীর উত্তর থেকেও রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের একটি পর্যায়ের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার চিত্র পাওয়া যায়। স্বামীজী-প্রদত্ত উত্তরগুলি নিম্নোক্ত প্রকার :

১। প্রায় সকল শাখাকেন্দ্রই খোলা হয়েছে। তবে আন্দোলনের এই সবে সূত্রপাত।

২। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই শিক্ষিত। যাঁরা নন, তাঁরাও ঐহিক শিক্ষা পাচ্ছেন। কিন্তু যদি লোককল্যাণ করতে হয়, সর্বোপরি দরকার পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা। সেই উদ্দেশ্য যাতে অবশ্যই সিদ্ধ হতে পারে সেজন্য অন্য শিক্ষার তুলনায় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

৩। ঐহিক শিক্ষকবৃন্দ : আমরা যাদের পাচ্ছি, তাদের অধিকাংশ পূর্ব থেকেই শিক্ষিত। এখন দরকার শুধু আমাদের 'পদ্ধতি' তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের চরিত্র তৈরি করা। এখানে তাদের শিক্ষা—আনুগত্যের এবং অভীঃমন্ত্রের; আর পদ্ধতি—দরিদ্রদের জন্য প্রথমে দেহপুষ্টির ব্যবস্থা করা, তারপরে উচ্চতর মানসিক পর্যায়ের দিকে এগিয়ে দেওয়া।

কলা ও শিল্প : পরিকল্পনার এই অংশটুকু অর্থাভাবের জন্য এখনি আরম্ভ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে সহজতম গ্রহণযোগ্য পথ হল—ভারতীয়গণকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে প্রণোদিত করা, এবং অন্য দেশে যাতে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের বাজার তৈরী হয়, তার চেষ্টা করা। একাজ তারাই করবে, যারা 'দালাল'-জাতীয় নয়, শুধু তাই নয়, যারা অপরপক্ষে লাভের সবটুকু অংশ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করবে।

৪। দেশের সকল জায়গায় ঘুরে বেড়ানো দরকার হবে, যে পর্যন্ত না 'জনগণ শিক্ষার কাছে আসে।' এই ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকেরা যে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ধর্মের মানুষ—এই জিনিসটি সর্বাধিক ফলপ্রদ হবে।

৫। সকল বর্ণের মানুষের মধ্যেই আমাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার মুখে। এপর্যন্ত উচ্চ বর্ণগুলির মধ্যেই কাজ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-কেন্দ্রগুলির কাজ পুরোপুরি চালু হওয়ার ফলে আমরা নিম্নবর্ণের মানুষদের উত্তরোত্তর প্রভাবিত করছি।

৬। প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুই আমাদের কাজের অনুমোদন করে। তবে এই জাতীয় কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করার ব্যাপারে তারা এখনো অভ্যস্ত নয়।

৭। হাঁ, নিশ্চয়, সেবাকাজে ও অন্যান্য সৎকাজে গোড়া থেকেই আমরা পীড়িত মানুষ কোন্ ধর্মাবলম্বী—সে হিসাব নিই না।

একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না। পুরুষের কথার নড়চড় হয় না। সে প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে আবার সতর্ক করে দিই। তোমাকে এখানে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মিস্ মূলার বা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া চলবে না।...

এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত বিবেকানন্দ-জীবনীতে ভারতের কল্যাণে নিবেদিতার ভূমিকা সম্পর্কে যেভাবে সশ্রদ্ধ মূল্যায়ণ করা হয়েছে, সে কথা সকলের জানা প্রয়োজন।

'যে সব পাশ্চাত্ত্য শিষ্য ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের শিক্ষাদান কাজটিকে চরম গুরুত্বপূর্ণ বলে এই মহান হিন্দু এবং বিরাট আচার্য মনে করেছিলেন। ...পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে একজনকে বেছে নিয়েছিলেন, যাঁর উপরে তাঁর গভীর আশা ও বিশ্বাস ছিল; সেইজন্য স্বামীজীর ধ্রুবজ্যোতিপূর্ণ আলোচনার প্রবাহ উক্ত শিষ্যার দিকেই সমধিক প্রবাহিত হত। ঐকালে যদি তিনি ভগিনী নিবেদিতার গঠনের অতিরিক্ত আর কিছু না করে থাকতেন, তাহলেও বলা যেত না, তাঁর সময় বৃথা গেছে।'

(৪)

নিবেদিতার মহাজীবন অসংখ্য ধারায় প্রবাহিত। ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে ভারতমুক্তির যে কাজে তিনি নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন সেই তো তাঁর আসল 'মায়ের কাজ'। তিনি কালী মায়ের প্রচার করেছেন, অসাধারণ যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন ভারতের মাতৃসাধনার কথা। দেশ-বিদেশ জুড়ে তাঁর এই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে ভারতের নারীশক্তির শ্রদ্ধার জায়গাটিকে কত সহজভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ-এর মাতৃরূপা কালীর ভাষ্য এই 'অগ্নিকন্যা-র মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করালেন গুরুদেব বিবেকানন্দ। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু অবলীলায় তা করলেন নিবেদিতা। প্রাচীন ভারতকে এতটাই বুঝলেন যে তার পুনর্জাগরণের দায়িত্ব তুলে নিলেন কাঁধে। 'বীরভোগ্যা স্বাধীনতা' লাভের জন্য ভারতবাসীকে তৈরি করতে এই আইরিশ কন্যাকে 'ধার' করে এনেছিলেন বিবেকানন্দ। অমরনাথে 'শিব'-এর কাছে এঁকে নিবেদন করেছিলেন তিনি। 'শিব'-এর দেশ ভারতবর্ষের জন্য এই বিদূষী, অসাধারণ সৃজনশীল মার্গারেট 'নিবেদিত' হল। আসলে—ভারতমায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত হল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি নিবেদিতা-র পূর্বজীবন, কিভাবে 'নিবেদিতা' গড়ে উঠছিলেন 'ওদেশে'। বিদেশী শাসকের দেশ থেকে একটি মেয়েকে 'ধার করে এনে তাঁকে দিয়েই রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ 'ভারতমুক্তি'-র সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করালেন। ভারতবাসীদের ক্রীতদাসত্বের থেকে মুক্তি দেওয়ার কাজটা একসময় তীব্রবেগে শুরু করলেন নিবেদতা। তাঁর প্রতিভার শাণিত তরবারি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাঁধনের দড়িকে। নীরবে। নিঃশব্দে।

চতুর ইংরেজ শাসকেরা তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি কোনও দিন। এমনই কৌশলী ছিলেন নিবেদিতা।

স্বামীজির প্রিয় মঠ তাঁর স্থায়ী ঠিকানা হয়নি। স্বামীজির মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল বেলুড় মঠ। কারণ তখন তিনি সর্বতোভাবে ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিত। বিরাট তাঁর কর্মকাণ্ড। শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাংবাদিকতা—বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে তিনি নতুন ভারতকে গড়ছেন।

নিবেদিতা দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের সার্থক উত্তরসূরী। পাশ্চাত্ত্য অনুকরণ নয়, জাতীয় ভাবধারার প্রগতিশীল পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম বিবেকানন্দ শুরু করেছিলেন রামকৃষ্ণের হাত ধরে। ফিরে তাকিয়েছিলেন অতীতে, নিজের দেশের মানুষের দিকে। রামকৃষ্ণ নরেনকে এইভাবে গড়ে তুলেছিলেন তিলে তিলে। 'দেশপ্রেমিক' হয়ে উঠলেন পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে। ব্রিটিশ শাসকের চরিত্র বুঝলেন। মানুষের জীবনের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বিশ্বে ছুটে গেলেন বলতে—সকলের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার কথা।

বিশ্বধর্ম সম্মেলনে সেদিন যে পতাকাটা ওড়ালেন—সেই শুরু ভারতের পথ চলা। সেই পথেই হেঁটে পৌঁছোলেন আরও দুই মহারথী—বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ। ভারতের এই তিন স্তম্ভ বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—ভারতের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, ভারতের বিজ্ঞানসাধনা ও দার্শনিকতা এবং ভারতের দর্শন ও সাহিত্য।

শিকাগোর বিশ্বধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ

ধীরে ধীরে ভারতমুক্তির 'রাজপথ' নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা, এই পথে এসে মিলল হাজারো 'দেশপ্রেমিক' যাঁরা দেশকে গড়ে তুলতে লাগলেন ভেতর থেকে। ভালবাসায়। আর এই রাজপথে দেশপ্রেমের ধ্বজা নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

(৫)

প্রজ্ঞা, প্রতিভা, প্রয়াস—এই তিনের ত্রিবেণীসংগম ভগিনী নিবেদিতা।

১৬ নং বোস পাড়া লেন-এর ছোট্ট স্কুল বাড়ি। নিঝুম দুপুর। চলছে বিজ্ঞান-গবেষণার লেখার কাজ। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। সহকারী নিবেদিতা। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে—ভারতবর্ষের বিজ্ঞানসাধনার কথা।

পৃথিবীকে চমকে দিয়ে বিশ্বের দরবারে পরাধীন দেশের বিজ্ঞানসাধক প্রতিষ্ঠিত করলেন—জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে। তাঁর এই সাধনায়, এই লড়াই-এ যিনি অন্যতম একনিষ্ঠ সহকর্মী তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

আশ্চর্য সমাপতন।

জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে—এই কথাই তো বলেছিলেন রামকৃষ্ণ। মায়ের পূজার ফুল-ও যিনি তুলতে পারতেন না একসময়, বলতেন সর্ববস্তুতে ব্রহ্ম। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন—জড়বস্তু কিভাবে সাড়া দেয়। কঠিন সে লড়াই। বিশ্বের দরবারে স্বামীজি আগেই প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন—ভারতের ধর্মভাবনা পৃথিবীর ভবিষ্যতের নিয়ামক। বলে এসেছেন তাঁর গুরুর কথা—মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নেই, ধর্মে ধর্মে কোনও ভেদ নেই। সবই এক।

দক্ষিণেশ্বরের পাঁচ টাকা মাস-মাইনের পূজারী সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন।

শিকাগোর ধর্ম-সম্মেলনে বিবেকানন্দের বিশ্বজয় আসলে ছিল ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার যুগ যুগ সঞ্চিত ভান্ডার সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার মহান লগ্ন। বিশ্বের কাছে খুলে গেল এক আলোর জগৎ।

সেই আলোর টানে ছুটে এলেন কয়েকজন মানুষ। তাঁদের একজন নিবেদিতা। ভারতবর্ষের যা কিছু তাঁর ভালো লেগেছে তিনি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন—এদেশে ও ওদেশে, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে।

বিবেকানন্দ পরিকল্পিতভাবে নিজের মতো গড়ে তুলেছিলেন তাঁর এই প্রিয় শিষ্যাকে। তাঁকে তিনি আজীবন 'ব্রহ্মচর্য'এর দীক্ষা দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস-এর দীক্ষা নয়। তাই তাঁর কাছে 'মঠ' ছেড়ে বেরিয়ে এসে ভারতের স্বাধীন জীবনচর্যা ও চর্চার ক্ষেত্রগুলিতে ডুবে যাওয়া সহজ হয়েছিল। সহজ ও সম্ভব হয়েছিল বিবেকানন্দের চিন্তা ও দর্শনকে আগুনের ভাষায় কাজে রূপ দেওয়া।

আর এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই চরমভাবে সার্থক বিবেকানন্দের-নিবেদিতা।

নিবেদিতার মধ্যে ছিল না কোনও আলো-আঁধারির খেলা। সত্যকে সত্য বলে জানতেন। মানতেন। এবং যা কিছু করতেন প্রবলতম শক্তিতে। এই শক্তির মূলে ছিল একনিষ্ঠতা। অধ্যবসায়। প্রগাঢ় প্রেম।

নিবেদিতা যখন ভারতে এলেন তখন ভারত তথা বাংলার সমাজজীবন ছিল অন্যরকম। ১৮৯৮-র বাংলা। সমুদ্র পার হলে 'জাত' যায়। আর সমুদ্র পারের মানুষকে ঠাঁই দিলে একঘরে হতে হয়। আমরা ভুলতে পারি না কয়েক দশক আগেই কৈবর্তের মেয়ের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরে বাংলায় কোনও পূজারী পাওয়া যায় নি। কঠিন সমাজশাসনের চোখরাঙানিতে। সব কিছু তুচ্ছ করে এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণের দাদা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরবর্তী কালে দায়িত্ব নিলেন রামকৃষ্ণ। যিনি শুধু জাতের বেড়াই নয়, ভাঙলেন—জড় ও জীবের প্রভেদ। বললেন জীবই শিব, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে। প্রিয় শিষ্য নরেনকে এই দক্ষিণেশ্বরে বসেই

তিলে তিলে গড়ে তুললেন এই বিশ্বাসে, যিনি বিশ্বে এই বাণীই প্রচার করলেন, প্রতিষ্ঠিত করলেন। আশ্চর্য লাগে, সেই বিশ্ববিজয়ী বীর সন্ন্যাসী তিনি সমুদ্র পেরোনোর অভিযোগে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে জীবনে কোনওদিন আর প্রবেশের অধিকার পেলেন না। অর্থাৎ সমাজের অনুশাষন তখনও কতো অনুদারি।

এই সমাজশাসনে বিদেশিনী নিবেদিতা এলেন। ঠাঁই পেলেন শ্রীশ্রীমায়ের কোলটিতে। তাঁর ঘরে 'খুকী' হয়ে। (যদিও কোনওদিন রামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর যাওয়ার সুযোগ হয়নি বা অনুমতি পাননি) তাঁরই কাছে বাসা পেলেন ১৬নং বোস পাড়া লেনে। উত্তর কলকাতার গোঁড়া হিন্দুয়ানিকেও টলিয়ে দিলেন তিনি। এই তাঁর প্রথম ভারতজয়।

ভারতবর্ষ আজীবন নিবেদিতার কাছে ছিল 'এদেশ'। আর নিজের জন্মভূমি হয়ে গিয়েছিল 'ওদেশ'। এই 'এদেশ' আর 'ওদেশ'—গোটা বিশ্বের আলোকদূতী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। হয়ে উঠেছিলেন lady of the lamp। বসু বিজ্ঞানমন্দিরের দেওয়ালে তাঁর এই বাস-রিলিফ আজ স্মরণ করতে হবে আমাদের।

স্মরণ করতে হবে, জনে জনে ডেকে বলতে হবে আমাদের ঘরের ছেলে জগদীশ বসু কত লড়াই করে ভারতের বিজ্ঞানসাধনার শ্রেষ্ঠত্বকে সেদিন বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নিবেদিতা আর তাঁর নিরলস প্রয়াস।

নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষে তাঁকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ আসলে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলোচনার ও গবেষণার সুযোগ ঘটাচ্ছে।

যে যুবসমাজকে রামকৃষ্ণ ডাক দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ তাঁদের নিয়েই নতুন ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়ে মঠ ও মিশন তৈরি করলেন। শিক্ষায়, শিল্পে, সমাজসেবায়, দেশসেবায়, দেশের স্বাধীনতা অর্জনে নিবেদিতাও সত্যই নূতন ভারত তৈরির বিরাট কর্মযজ্ঞ করে গেলেন যুবসমাজকে নিয়েই।

মেলালেন। তিনি মেলালেন। প্রকৃত অর্থেই মেলালেন। এই মিলন ঘটল সব অর্থেই এবং অবশ্যই যত মত তত পথের সাধনায়।

মত ভিন্ন। পথ ভিন্ন। উদ্দেশ্য এক।

নিবেদিতা সম্পর্কে বিবেকানন্দ তাঁর ঘনিষ্ঠ গুরু ভাইদের কাছে বলতেন—'আমার এক বড়ো পাওয়া।'

আদতে তিনি পেয়েছিলেন একজন 'তৈরি মানুষ'ই । নিবেদিতা জীবনের প্রতিটি পর্বেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন প্রকৃত অর্থে নিবেদিতা।

বোসপাড়া লেনের সেই ছোট্ট ঘর বিজ্ঞানী বোস-এর সাধনক্ষেত্রে-র সাম্প্রসারিত অংশ হয়ে উঠতে পেরেছিল। পরবর্তীকালেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্মের সূচনা যেন ওখানেই। কিভাবে তা সম্ভব হয়ে উঠেছিল সেকথা জানতে আমরা যতটা উৎসুক, জানাতেও বোধকরি দায়বদ্ধতা।

(৬)

১৮৯৩-এ চিকাগো ধর্মসভায় বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও সাফল্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 'জাতীয়তাবোধ'-এর উন্মেষ ঘটায় বাস্তবিক অর্থে। মাত্র তিরিশের এক ভারতীয় যুবক সর্বত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী 'বিশ্ব-চরিত্র' হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ ভারতের শাসক-সম্প্রদায়ের কাছে সেদিন বিরাট আঘাত নেমে এল। ১৮৯৫ পর্যন্ত দেড় বছর আমেরিকায়

বোসপাড়া লেনের আবাসে বালিকা বিদ্যালয়-এর ছাদে নিবেদিতা।

আধ্যাত্মিকতার নতুন ভাষ্য শোনালেন তিনি। ফিরে এলেন কয়েক মাসের জন্য ইংলন্ডে। খোদ ব্রিটিশ-শাসকের দেশে। আবার আমেরিকা। তখন তিনি 'দুই গোলার্ধের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক'।

ঠিক এই সময়েই বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্রও নানা পত্রিকায় উল্লেখিত হচ্ছেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের 'থিয়জফিস্ট' পত্রিকায় তাঁর গবেষণার সাফল্য নিয়ে লেখা হচ্ছে—

'For the honor of India, let us all hope the rumor is true that Professor J.C.Bose of the Bengal presidency college, has made an original discovery, if demonstrated to be all that is claimed for it, place him in the front rank among modern scientist, It is said that. Bose has been experimenting on the theory that the waves may be used for telegraphing and all conducing wares displeased with. It is alleged that he has achieved the result of seeding signals of sound and light between two points with the help of ether only'.

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ। বিশ্বের নানা ক্ষেত্রে 'ভারতের উদয়'-এর বছর। স্বামীজি তখন ইংলন্ডে। জগদীশচন্দ্র বসুও সেখানে। কুমার রণজিৎ সিংজী ক্রিকেট দিয়ে প্রতিষ্ঠিত

স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস

রণজিৎ সিংজি

অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করলেন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রমাণ করলেন ইংরেজকে তাদের জাতীয় খেলায় অতিক্রম করা সম্ভব। অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওই বছরই আই সি এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করলেন। বিজ্ঞানী বসু-র বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিশ্ব-স্বীকৃতি আদায় করল। অন্যদিকে, লন্ডনের ড্রইংরুমে ও নানা সভাঘরে স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা ও প্রশিক্ষণে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় চলছে সেইসব জয়-ঘোষণা।

কেমব্রিজে 'ইন্ডিয়ান মজলিস' রণজিৎ সিং ও অতুল চ্যাটার্জিকে সংবর্ধিত করছে। সভা ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলগানে মুখরিত। সেখানে বিবেকানন্দও উপস্থিত। বজ্রনিনাদিত কণ্ঠে ভারতে রাজভক্তদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন যে ভারতের এই পতনই শেষ কথা নয়, ভারত আবার উঠবে। ইতিহাসে দক্ষ অতুল চ্যাটার্জিকে বললেন, যে ইতিহাস অসুস্থ দাসত্ববোধের মধ্যে আত্মমর্যাদা আনবে, ভারতের সেই যথার্থ ইতিহাস রচনা করতে।

সেই সংবর্ধনা সভায় আমন্ত্রিত হননি বিজ্ঞানী বসু। বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারতের ভবিষ্যৎবাণীতে হয়তো তাঁর কথাও বলা আছে। পরবর্তীকালে যাঁর কাজের অন্যতম প্রেরণা হয়ে উঠেছেন তিনি এবং অন্যতম প্রেরণাদাত্রী ও সহকর্মী হয়ে উঠছেন নিবেদিতা।

১৮৯৮-এর শেষদিকে নিবেদিতার যোগাযোগ ঘটে বিজ্ঞানী বসু-র সঙ্গে। ওই বছরই ২৮ জানুয়ারি তিনি ভারতবর্ষে আসেন।

জগদীশচন্দ্র তখন গভীর সংকটে। চাকরি শুষে নিচ্ছে মূল্যবান সময়। গবেষণার জন্য যে সময় ও পরিকাঠামো দরকার তা নেই। ইংলন্ডে গবেষণায় সাফল্য লাভের পর বড়ো চাকরির সুযোগ ফিরিয়ে দিয়ে আবার প্রেসিডেন্সি কলেজেই এসে কাজে যোগ দেন, চলে গবেষণার কাজ। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি শ্রান্ত, বিষণ্ণ, যন্ত্রণাকাতর। অথচ তাঁর দুটি উদ্দেশ্য পূরণে তিনি মরীয়া— এক, চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজ ও ভারতীয়ের বৈষম্য দূর করা এবং দুই, প্রমাণ করা যে ভারতীয়রাও বিজ্ঞানশিক্ষা দিতে পারে, বৈজ্ঞানিক হতে পারে। সেই পরাধীন ভারতবর্ষে এই দুই উদ্দেশ্য সাধন করার সংগ্রাম বড়ো কঠিন। এই কঠিন পথেই তিনি হাঁটলেন। এই পথেই শুরু হল তার 'দেশমাতৃকা'-র পুজো।

সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা পড়ানোর দায়িত্ব পালন করে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ চলল। ইউরোপ থেকে বিজয়ী বিজ্ঞানীর

মিসেস ওলি বুল

গৌরব নিয়ে ফেরার পর ইংরেজ সহকর্মীদের বৈষম্যমূলক আচরণ আরও তীব্রতা পেল।

মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত জগদীশচন্দ্র। এই সময় তাঁর জীবনে 'আলোকদূতী' হয়ে এলেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দের সঙ্গে সংযোগ গড়ে দিলেন মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে, বিবেকানন্দ যাকে 'মা' বলে মানতেন, যাঁর আর্থিক সহায়তায় তিনি বেলুড় মঠের অনেক কাজ করলেন সেই মিসেস বুলের কাছে নিবেদিতা অনুরোধ জানালেন এই 'বিজ্ঞানী'-কে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে। আমেরিকার এই ধনী মহিলার বিশাল হৃদয় জুড়ে রইল 'দুই পুত্র'— বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র।

ছিলেন সারদামণির এই 'খুকী' নিবেদিতা নিজেও, জগদীশচন্দ্রকে মাতৃস্নেহে 'খোকা' করে তুললেন।

বিশ্বসভায় ভারতের বিজ্ঞানসাধনাকে তিনি অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই-এ নামলেন। এই কাজ আর একা বিজ্ঞানী বসু-র নয়, নিবেদিতারও। বসুর মানসিক শান্তি, শারীরিক সুস্থতা, আর্থিক সহায়তা, গবেষণাপত্র পুস্তক আকারে রচনার নিরলস পরিশ্রম,

গবেষণার সাফল্যের প্রচার—একা হাতে সামলালেন নিবেদিতা। পাশাপাশি চলল আরও অনেক কাজ।

(৭)

ওই সময় ভারতবর্ষে দুজন আন্তর্জাতিক চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন—বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র। এই দুই-এর মাঝে নিবেদিতা। বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস কংগ্রেসে আমন্ত্রিত। একজন ধর্মেতিহাসের সভায়, আরেকজন বিজ্ঞানসভায়। ভারতমাতার দুই সন্তান বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে দুজন দুজনকে দেখলেন নিজস্ব ক্ষেত্রে স্ব-প্রকাশিত হতে। মাতৃভূমি এবং বহুসভ্যতার ধাত্রীভূমি ভারতবর্ষের জীবনসত্যকে বাইরে উদ্‌ঘাটনের জন্য এই দুই বিজ্ঞানী নানা মতপার্থক্য সত্ত্বেও একই ভূমিতে অবস্থান করছিলেন। নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ক্ষণ, পরাধীন ভারতমাতার কাছে মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত গৌরবের, তাঁর দুই কৃতি সন্তান তাঁর মাথা সর্বোচ্চ-এ তুলে ধরতে সর্বস্বপণ করেছে যেন !

প্যারিস থেকে স্বামীজী লিখেছিলেন—

> *"আজ ২৩শে অক্টোবর (১৯০০); কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ—সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালি প্রভৃতি বুধমন্ডলী-মন্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভমন্ডলীর মধ্যে হতে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির—নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে.সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমন্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ দান করলে ! সমগ্র বৈদ্যুতিকমন্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী—ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী-সাধ্বী, সর্বগুণাসম্পন্না গৃহিণী যে-দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি !" (পরিব্রাজক)*

স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস এবং লেডি অবলা বোস (১৯০০)

পদার্থবিদ্যা ও শারীরবিদ্যার সীমান্তরেখা মুছে ফেলে বিজ্ঞানী বসু 'জড়ের সাড়া' দেওয়ার প্রমাণ রাখলেন। জড় ও জীবের অখণ্ড সম্পর্ক রামকৃষ্ণের-বিবেকানন্দের কাছে যেন তাঁর গুরুর সত্যদর্শন। তাই পুলকিত বিবেকানন্দ।

ডাক পেলেন বসু রয়াল সোসাইটিতে পেপার পড়তে। আহ্বান পেলেন ইংলন্ডে চাকরির। ১০ মে, ১৯০১। রয়াল ইন্সটিটিউশনে বক্তৃতা দিলেন। শারীরতত্ত্ববিদরা প্রকাশ্য আপত্তি করলেন না, কিন্তু ৬ জুনের সভায় দুই শারীরতাত্ত্বিক—বার্ডন স্যান্ডারসন এবং ড: ওয়েলার আপত্তি জানালেন। বিস্মিত বসু দেখলেন, পদার্থ বিজ্ঞানকে শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে বিজ্ঞানের যে বিভাজনরেখা তিনি গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন তা এঁরা মানতে পারছেন না। বসুর পেপার মুদ্রিত করেও প্রকাশ করা হল না। বিজ্ঞানীরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে জানা যায় সভাপতি স্যার উইলিয়াম ক্রুকস যিনি তাঁকে বক্তৃতায় আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনিই তাঁর 'কাস্টিং ভোট'-টি বসুর বিরুদ্ধে দিয়েছিলেন।

১৯১৪ সাল, ইংলন্ডে বসুর গবেষণাগারে একদিন ঢুকে পড়ে এই ক্রুকসই জানিয়েছিলেন যে তাঁরই 'কাস্টিং ভোট'-এ রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় বসুর 'প্ল্যান্ট রেসপন্সের'-এর পেপার প্রকাশিত হতে পারেনি। বসুকে

হতভম্ব করে দিয়ে তিনি আরও বলেন—*আমি বিশ্বাসই করিনি ও জিনিস সম্ভবপর। মনে করেছিলাম, আপনার প্রাচ্য কল্পনাবিলাস আপনাকে বিপথে চালিত করেছে। এখন আমি সর্বতোভাবে স্বীকার করছি। আপনি প্রথমাবধি ঠিক।*

কিন্তু ১৯০১ থেকে ১৯১৪—লড়াই তো থেমে থাকেনি। লাঞ্ছিত বসু ফার্লো নিয়ে ইংলন্ডে থাকতে মনস্থ করলেন। রয়াল ইন্সটিটিউশনের ল্যাবরেটরিতে কাজ আরম্ভ করলেন। লীনিয়ান সোসাইটি তাঁকে বক্তৃতার সুযোগ দিলেন ১৯০২-র ২১ মার্চ। তাঁদের কাগজে বসুর পেপার প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে ড: ওয়েলার বসুর বক্তৃতার 'নোট' নিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করে মৌলিক গবেষণার দাবি জানায়। এক অর্থে যাকে 'চুরি' বলা হয়। তদন্ত শুরু হয়। বসুর কাজই স্বীকৃতি পায়।

রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর গবেষণা প্রকাশের সুযোগ না থাকায় ডঃ বসু তাঁর গবেষণার ফল বই-এর মাধ্যমে জানাবার সিদ্ধান্ত নেন।

ভারতবর্ষে থাকতেই নিবেদিতা ডঃ বসুর জন্য ইউরোপে চাকরির ব্যাপারে চেষ্টা চালান। যাতে বসু ইউরোপ থেকে গবেষণার কাজ করতে পারেন। যদিও নিবেদিতাও চাইতেন, তিনি মনপ্রাণ ঢেলে শুধু গবেষণার কাজ করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুক।

(৮)

রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে বিজ্ঞানী বসু মেলে ধরেছেন তাঁর অসাধারণ উপলব্ধিকে—

৩১
লন্ডন
১১ জুলাই ১৯০১

বন্ধু,

তুমি কি করিয়া জানিলে আমার হৃদয়ে দিবারাত্রি কি সংগ্রাম চলিতেছে ? আমি নিশ্চয় জানি যে আমার ভিতরে এখন যাহা আসিয়াছে তাহা যদি অল্প সময়ের জন্যও ছাড়িয়া দি তাহা হইলে তাহা আর ফিরিয়া পাইব না। দীর্ঘ রোগশয্যার সময় আমি বহু যত্নে মন স্থির করিয়াছিলাম, তাহার পর এই ছয় মাস মাত্র একাগ্রভাবে সাধনা করিয়াছি। এতদিনের চেষ্টার ফলে এখন আমার মন প্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া কি এক আলোক আসিয়াছে। দেখ, যদি সমস্ত বৎসরের চেষ্টার ফলে কেহ একটি Paper Royal Society-তে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে কৃতার্থ মনে করে। আমি ছয় বৎসরের কাজ এই ছয় মাসে করিয়াছি।

1. On the continuity of effect of Light and Electric Radiation of Matter.১

দৃশ্য এবং অদৃশ্য অলোকের একই প্রভাব প্রমাণিত হইয়াছে।

2. On the similarity of effect of Mechanical and Radiation strains.২

3. On a new theory of photographic action.৩

4. On the Electric Response of Inorganic Substance.৪

5. On the three types of electric conduction.৫

এই কয়টি বিষয় এই কয় মাসে শেষ করিয়াছি এবং Royal Society তে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার এক একটি বিষয়ে জীবনব্যাপী নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া কার্য্য রহিয়াছে। যদি কেবল যশঃসঞ্চয় তোমাদের অভিপ্রেত হয় তবে এই সব নূতন বিষয় দ্বারা সহজেই করিতে পারি। কারণ এই সব বিষয় পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, ইহার সমস্ত মূলমন্ত্র সহজেই সাধনা করিতে পারিব এবং সকলকে বুঝাইতেও পারিব।

কিন্তু জীব ও নির্জ্জীব জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে আমার সমস্ত জীবন দিতে হইবে। কারণ ইহা দুই মহাশাস্ত্রের সন্ধিস্থলে। এ দেশে বিভিন্ন শাস্ত্রব্যবসায়ীর

মধ্যে কি গুরুতর বিরোধ তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। Physicist এবং Chemist এবং উভয়ের সহিত Physiologist দের অহর্নিশ দ্বন্দ্ব। সাবধান কেহ যেন নিজ সীমা লঙ্ঘন [না] করেন ! আমরা Physiologist— আমরা জীবিত বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করি— We do not deal with dead matter. We do not depend on mere physical laws !

আমরা বহুবাদী এরূপ কিম্বদন্তী আছে।— প্রকৃত বহুবাদী কে এখন বুঝিতে পারিতেছি।

তুমি হিং টিং ছট লিখিয়া আমাদের দেশবাসীকে গালাগালি দিয়াছ। যদি এ দেশের হিং টিং ছট দেখিতে ! আমরা কোথায় লাগি ! সম্পূর্ণ অর্থহীন ঘোর বাগাড়ম্বর— যে বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা কম জানা সে বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা শব্দাড়ম্বর।

চিমটি কাটিলে দেখা যায় A+ হইয়াছে এবং B- হইয়াছে— বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালিত হয়।

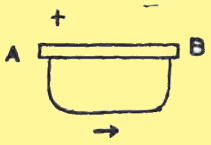

explanation— this is because stimulus produces anodic and kathodic difference !!

(Anode=Greek for+

Kathode=Greek for-

এ সব ত কিছুই নয়—কথার ঘটা এতদূর বাড়িয়াছে যে একজন Physiologist অন্যের অর্থ বুঝিতে পারেন না।

'Wonderful is the power of word ! I and Herring have been fighting all the time ; by the same word he meant one thing and I another !'

সুতরাং এই সমস্ত জাল ভেদ করিতে হইবে। তার পর হয় এক theory কিম্বা অন্য theory টিকিয়া যাইবে। Both cannot be true, one must give way to the other.

সুতরাং বুঝিতে পার ইহাতে জীবনসর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। আমি একদিকে একা, কিন্তু তোমরা যদি বল তবে আমি প্রস্তুত আছি। আমি সহজ পথ ত্যাগ করিয়া কঠিন বর্ত্ম অবলম্বন করিব। হিন্দুরা কোনদিন ফলের আশায় কাজ করে নাই, ইহাতেই তাহাদের নিষ্ফলতা, ইহাতেই তাহাদের গৌরব!

তবে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবারও বিশেষ কারণ দেখি না; তোমাকে যে সব কথা আগে লিখিয়াছি তাহা কেবল তোমার মন বহুকাল অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য। সেদিন Sir William Crookes আমাকে বলিলেন, 'Prof. Bose, you will hear that many are engaged in the country in Research work—they are engaged in work which will lead to nothing, but you have hot something of which there will be no end.'

বর্ত্তমান কালের ধাতু (metallurgy) সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত Sir Robert Austen, F.R.S.-এ দেশের mint-এর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। তিনি আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি ৩০ বৎসর ধাতুর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছি— আপনি যে সমাচার সেদিন অকুতোভয়ে প্রচার করিলেন সেরূপ একটা ধারণা অজ্ঞাত ও ঝাপসা ভাবে আমার মন আক্রমণ করিয়াছিল। আমি ভয়ে ভয়ে একবার Royal Instn. এ এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, এবং সেজনএ বহুরূপে তিরস্কৃত হইয়াছে। আপনি যেরূপ সাহসের সহিত এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এ বিষয় প্রচার করিয়াছেন তাহাতে আমার অনেক দ্বিধা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে।'

তবে আমাকে নিজের বলের উপর নির্ভর করিয়া নিজ চেষ্টায় প্রমাণিত করিতে হইবে। আমি নির্জ্জীবের যে সব স্পন্দনরেখা ফটোগ্রাফী দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছি তাহার দুচারিটি নমুনা পাঠাইতেছি, অন্যদিকে জীবিতের স্পন্দনরেখার সহিত মিলাইয়া দেখিবে।

প্রকৃতিদেবী কি আমাদিগকে কখনও প্রতারণা করিয়া থাকেন? যদি তাহা না হয় তবে এই দুই এক।

আরও অনেক বলিবার ও করিবার আছে, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। তোমার এই পুস্তকখানা দেখা হইলে ত্রিপুরার মহারাজকে আমার হইয়া পাঠাইয়া দিবে। তাঁহার উৎসাহবাক্যে আমি বিশেষ উৎসাহিত।

আমি এতদিন কল ও অন্যান্য জিনিস স্থির করিবার পর সবে কাজ আরম্ভ করিয়াছি। আমরা একজন assistant-কে এই ছয় মাসে সবে মাত্র কাজ সম্পূর্ণ করিয়া শিখাইয়াছি। এই সময়ে ত্যাগ করিয়া গেলে সমস্তই শেষ হইবে। আর আমার এই পূর্ণ হৃদয়ে এখন বাধা পাইলে আর কোন দিনও ফিরিয়া পাইব না।

তুমি যে জন্য অনুরোধ করিয়াছ দিনরাত্রি কি আমার মনে সেরই এক কথা সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইতেছে না? তোমরা আমার সমস্ত বোঝা লইয়া আমাকে একাগ্রভাবে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছ তবে দ্বিধা করি কেন?

এ কথা যদিও সত্য বটে যে politics-এর জন্য Bhownagree-র জন্য ভারতবর্ষ হইতে ৩০০০ পাউণ্ড প্রেরিত হয়, আর আমাদের পূজনীয় নারোজীকেও ভারতবর্ষীয়েরা স্মরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবন নিরুদ্বেগ করিয়াছেন। আর তাতার University-র জন্যও

এ দেশ হইতে ২৫০০ হইতে ১২০০ মাসিক বেতনে ইংরাজ অধ্যাপক মনোনীত হইবে।

কিন্তু politics-এর জন্য যেরূপ উৎসাহ বিজ্ঞানের জন্য কি সেইরূপ উৎসাহ আছে? আর আমার জন্মভূমি বাঙ্গলা দেশ ত অতি দীন।

এজন্য দ্বিধা করিতেছিলাম। আরও মনে করিয়াছিলাম যে তোমাদের নিকট হইতেই আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই, তোমাদের সাধুবাদও আমার জীবনের প্রধান গৌরব, যদি কোন দিন তাহা হইতে বঞ্চিত হই তাহা হইলে আমার মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক যাতনা হইবে।

কিন্তু তোমার লেখা হইতে আমি বুঝলাম যে তোমাদের স্নেহ হইতে আমি কখনও বঞ্চিত হইব না। এ কথা আমাকে পুনঃ পুনঃ শুনাইও। আমার জীবনপ্রাণ দেশে ধাবিত হইতেছে, আমি অতি কষ্টে নির্ব্বাসনকষ্ট ভুলিয়া থাকি।

তুমি ত আমার জীবনবৃত্তান্ত কিছু কিছু জান। আমি যখন একেবারে অসহায় হইয়াছিলাম তখন আমার ভগিনীর স্নেহ ও সহায়তায় আমি কোনরূপ দুর্দ্দিন উত্তীর্ণ করিয়াছি। এখন হয়ত সময় আসিতেছে যখন আমাকে তাহাদের সহায় হইতে হইবে। ডাক্তার মোহিনীমোহন গুরুতর পীড়াগ্রস্ত। এসব কথা আর কি বলিব!

আমি এখানে গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক ৪৫ পাউণ্ড অর্থাৎ বাৎসরিক ৮১০০ টাকা + বৃত্তি ২০০০ + Research-এর জন্য ২৫০০ = ১২৬০০ টাকা পাই। আমার assistant এবং কল ইত্যাদির বাবদ প্রায় ৪০০০ টাকা খরচ হয়— আর বাকীতে আমাদের এখানকার খরচ অতি সাবধানে চালাইতে হয়— কারণ এখানে অনিবার্য্য বৈজ্ঞানিকদের সহিত মেলামেশার জন্য কিছু অধিক খরচ হয়। এ পর্যন্ত দেশের জন্য কিছু পাঠাইতে পারি নাই, এবং এ দেশে অর্থাৎ Germany ইত্যাদি অবশ্য-গন্তব্য স্থানে যাইতে পারি নাই। এরূপ অবস্থাতে চাকুরী রাখিয়া চলিব কি না জানি না।

আমি যে assistantকে তৈয়ারী করিয়াছি তাহাকে যদি না রাখিতে পারি তাহা হইলে সমস্ত কার্য্যই বিফল হইবে, কারণ আর নূতন কাহাকে শিখাইয়া লইতে আমার আর সাধ্য হইবে না। যদি শীঘ্রই এ দেশে ফিরিয়া আসা উচিত মনে কর তবে ইহাকে বরাবরের জন্য নিযুক্ত করিতে হয়।

যদি কার্য ত্যাগ করা উচিত মনে কর তবে এ কথা আপাততঃ যেন বাহির না হয়। আমি তাহা হইলে এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাইব, যেন আমার ৩/৪ মাসের অবর্ত্তমানেও কার্য্য চলিতে পারে।

আমাকে অতি শীঘ্র পত্রোত্তর দিবে।

তোমার মিনির বিবাহ হইল,[১৩] কাবুলীওয়ালা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছে।

তোমার
জগদীশ

(৯)

নিবেদিতা নিজেকে নিবেদন করেছিলেন ভারতের গৌরব পুনরুত্থানে। সেই কাজেরই একটি ধারা পূর্ণতা পেল বিজ্ঞানী বসুর সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে। তাঁর বিরাট কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি অত্যন্ত নিষ্ঠায়, একাগ্রতায়, সেবায়, সাধনায় তিনি বিজ্ঞানী বসুর গ্রন্থ ও পেপার রচনার কাজ করে গিয়েছিলেন। আবাল্য উদ্ভিদবিদ্যায় আগ্রহী, অধ্যাত্মসাধনায় উৎসাহী মানুষটি মাত্র ১০ বছরে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম চারটি বই প্রস্তুত করা, প্রচুর পেপার লেখা, নকশা তৈরি করা, চিত্র সংযোজন করার কাজ করে গিয়েছেন সহকারী হিসেবে। উল্লেখ্য এই চারটি বইয়ের মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। হাজারখানেক নকশা সংযোজিত, যেগুলি এঁকেছিলেন নিবেদিতা ভারতীয় বিজ্ঞানকে প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌছে দিয়েছিলেন এই মহীয়সী।

তিনি এই কাজকেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাজ বলেই মনে করতেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর কিছুটা স্বাধীনভাবে নিজের পথ রচনা করেন নিবেদিতা। এইসময় বিভিন্ন চিঠিপত্র ও বক্তৃতায়, লেখায় ভারতের এই বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসের অজস্র উপকরণ তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন। তাঁর এইসব চিঠির দু-একটি পড়লেই বোঝা যাবে তাঁর কাজের গভীরতা, নিষ্ঠা ও বিস্তৃতি।

এই অত্যাশ্চর্য বিজ্ঞান-প্রকাশনার কাজকে তিনি বারে বারে 'আমাদের' বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯০৪ থেকে ১৯০৭ সালে লেখা নিবেদিতার নানা চিঠি থেকে সেই সময়ের তাঁর কাজের কথা জানা যায়। তখন তিনি খুবই ব্যস্ততার কথা বলছেন। জানাচ্ছেন—তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। বৈজ্ঞানিক সহায়িকার কাজে তিনি ব্যস্ত, ব্যস্ত বিজ্ঞানী বসুও।

২৪ মার্চ, ১৯০৪ সাল। ম্যাকলাউডকে লিখছেন—

'... আজ লেখার সময় খুবই অল্প, কারণ এই সপ্তাহে বিজ্ঞানের দাবি ছিল প্রচণ্ড, এবং সে চাপ বজায় থাকার সম্ভাবনা আছে।'

ওলি বুলকে, ১৪ এপ্রিল লিখছেন—

'আমাদের প্রিয় খোকা এত কঠোর পরিশ্রম করছে !'

১৪ জুলাই ওলি বুলকে লিখছেন—

রয়্যাল সোসাইটি বসুর পেপার প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছে। 'ট্রানজাকশনেস্—এর জন্য গৃহীত হওয়ার অর্থ—ইংলন্ডের বিজ্ঞানের রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হওয়া। এ পর্যন্ত, যা হয়েছে এটি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা।'

২১ জুলাই তাঁকেই লিখছেন—

"আমরা 'ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশন' নিয়ে কী গর্বিত! এখন যদি বোটানি বইটি লিখে ফেলতে পারা যায়! তারপর আমরা আবার ফিজিক্স-এ ফিরে যেতে পারব।"

২৮ জুলাই, ওলি বুলকে আবার লিখছেন—

"Philosophical Transaction-এ খোকার পেপার প্রকাশের তাৎপর্য বুঝতে পারো কি ? এর অর্থ—১৯০১-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চে সে বোটানিতে ডুব দেয় এবং ১৯০৪-এ এমন কিছু লিখল যাকে ইংরেজরা ওই বিষয়ে তাদের বেদগ্রন্থে প্রকাশ করতে পেরে গর্ব অনুভব করতে পারল। ১৯০৪ শেষ হবার আগে একটি বই প্রস্তুত করার যথেষ্ট আশা রাখে, যা উদ্ভিদ জগৎ পরিক্রমণ করে ব্যাপারটার ইতি করে দেবে। সাড়ে তিন বছরের কাজ একটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানকে তার মূলীভূত ঐক্যের সমন্বিত রূপে অঙ্গীভূত করে ফেলল! ভাবো একবার! সব রেকর্ড গুঁড়ো ! পরের মেলে রয়াল সোসাইটিতে খবর পাঠাবার আশা রাখি। বর্তমানে দমবন্ধ করে আমাদের কাজ চলেছে, গ্রহণ, বর্জন, সংযোজন প্রভৃতি। আমার ক্ষুদি-ক্ষুদি লেখার চেহারা দেখলে তুমি হাসবে।

ভারতের 'ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি' বা উচ্চতর বিজ্ঞানের জন্য একটি ভারতীয় বৃত্তির প্রবর্তন করে তোমার পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কি? খুব খরচ হবে কি? আমেরিকা হয়ত একদিন খুবই কৃতজ্ঞতা বোধ করবার কারণ খুঁজে পাবে।"

২১ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে লিখছেন—

"আমার অযোগ্য মস্তকটির যে রেখাচিত্র মিস স্টাম করেছেন, তার ফটোগ্রাফ ও মুদ্রণ কী মনোরম হয়েছে ! বিজ্ঞানের মানুষটি (বসু) শাসিয়ে রেখেছেন, এইটি ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আমার পোরট্রেট বললে শেষ করে ফেলবেন। আর—এটিকে সত্যিই ভালবাসি, কারণ এর রচনায় স্বামীজীর সাহায্য ছিল। কী মধুর দিনই না ছিল তখন!

বিজ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ। গত একবছর ধরে আমরা যা লিখেছি তা একেবারে বোমা ! প্রায় মাসে-মাসে একটি করে পেপার। শেষের দিকে গতি একটু কমাতে হয়, কারণ আমাদের শারীরিক সামর্থ্য একেবারে নিঃশেষিত হবার মুখে। যাইহোক, ভরসা করি, এ অবস্থা স্থায়ী হবে না, অবকাশযাপনের পরে আমরা আবার নবোদ্যমে কাজ আরম্ভ করতে পারব, একটা বিরাট বইয়ের কাজ, যা দু'বছরের মতো সময় নিতে পারে। কাজটি চলতি ধারণার থেকে এত অগ্রগামী এবং এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে যে, অবিলম্বে এর প্রকাশন সম্ভব হবে না। গত অক্টোবরের কাজ ইংলন্ডে বৈজ্ঞানিক সমাজে কয়েক মাস আগে সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা আরও ডজনখানেক কাজ করে ফেলেছি যা বিবেচিত হবার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি!

ভেবে আনন্দ হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতের দান তার মূল রূপে যেমন, তেমনি লেখায় প্রকাশের ক্ষেত্রেও সামান্যতম ত্রুটিযুক্ত থাকবে না। এইদিক থেকে আমার আশা করতে পারি, সর্বকালে এটি ক্লাসিক হয়ে থাকবে।"

১৯০৪ সালের ১ ডিসেম্বর একটি চিঠিতে বিজ্ঞানী বসুর জন্মদিন সম্পর্কে তিনি বলছেন—গতকাল ছিল খোকার জন্মদিন, এই দিনটিকে বলি ***'বজ্রদিন'****, কারণ তার দশ বছরের ব্রতের সমাপ্তি ঐ দিনে, এখন সে মুক্ত। মনে হয়, স্বাধীনতা সর্বদাই ঐ রকম—সকল বহিরঙ্গ বাধ্যবাধকতার সমাপ্তি—তখন—"আমার আর কিছু করার নেই, ঈশ্বর তাই সহায় হোন!"*

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিবেদিতা যখন ডঃ বসু, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন, তখন তিনি বজ্র চিহ্ন আবিষ্কার করেন। **'বজ্র'**-কে বসু ও নিবেদিতা দু-জনেই প্রতীক করেছিলেন। নিবেদিতা চেয়েছিলেন, ভারতের জাতীয় পতাকায় **'বজ্র'** প্রতীক রাখা হোক।

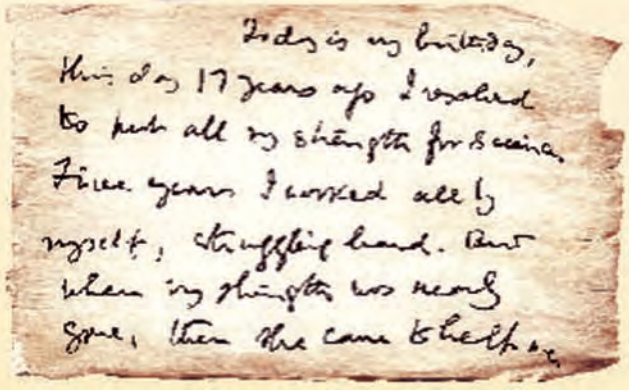

নিবেদিতা ১৯১০ সালের নভেম্বর জেনোয়া থেকে বসুর জন্মদিনে চিঠি লিখছেন। এটিই তাঁর বসুকে জন্মদিনে লেখা শেষ চিঠি। এই চিঠিতে সম্পর্কের গভীরতা অতলস্পর্শী।

"আমাদের পরম প্রিয় তিরিশ তারিখটি—শ্রেষ্ঠ জন্মদিনটি—ঐ দিনেই এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছবে। অনন্ত পুণ্যে পূর্ণ হোক এই দিন; নিত্য প্রসারিত মাধুর্যে ও আশীর্বাদে সম্পূর্ণ হয়ে আবির্ভূত হোক বারবার এই মহাদিন! বাইরে দেখতে পাচ্ছি ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সুমহান মূর্তি, তার তলায় শুধু লেখা, 'লা পাত্রি', আর ভাবছি, একদিন আসবে যখন এই কথাগুলি তোমার নামের নীচে মৌন-মুখর শব্দরূপে উৎকীর্ণ থাকবে। ঐ বিরাট দুঃসাহসী মানুষটি—এবং তাঁরই মতো আরও দুঃসাহসীর দল যাঁরা নিজ দেশবাসীর কল্যাণের জন্য অজানা সমুদ্রে পথ খুঁজেছেন—ওঁদের সকলের সঙ্গে তুমি ইতিমধ্যেই কিভাবে না আত্মিক সম্পর্কে গ্রথিত হয়ে গেছ!

জয়ী হও—চিরজয়ী! মানুষের সামনে হও আলোক, পদতলে হও প্রদীপ। আর শান্তি, গভীর শান্তি পাও তুমি—তুমি নূতন ভুবনের আবিষ্কর্তা—চেতনাসমুদ্রের হে মহান নাবিক!"

১৩ সেপ্টেম্বর, মৃত্যুর প্রায় এক মাস আগে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে যা লেখেন, তার মধ্যে ডঃ বসুর বিষয়ে তাঁর শেষ বক্তব্য পাই—

"শেষ চিঠিতে খোকার সম্বন্ধে যা বলেছ, কী প্রাণোত্তপ্ত সত্য কথাগুলি! তুমি বলেছ তুমি বসুর জন্য গর্বিত, কারণ বিজ্ঞানে অপারদর্শী ভারত তাতে পারদর্শী হয়েছে। আমার ধারণা, স্বামীজী ঠিক এই কথাই ভাবতেন; মনে হয়, তিনি তাকে এত ভালবাসতেন যা আমরা ভাবতেও পারি না। আমি নিজে সর্বদা অনুভব করেছি, ভারতের মহিমার বিষয়ে কখনো সন্দেহ করা যাবে না যদি আধুনিককালে ভারতের বিপাকের অবস্থার কথা ভাবার পরে চিন্তা করে দেখি—তা সত্ত্বেও ধর্মে ও বিজ্ঞানে পৃথিবীর জন্য ভারতবর্ষ কতখানি দিয়েছে! ডঃ বসুর কাজের মূল্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। ভারতে আরও যেসব মহান ব্যক্তি আছেন ভারতের সেবার দ্বারাই তাঁরা মহান; সীমাবদ্ধ এক গোষ্ঠীর মধ্যেই তাঁরা কাজ করেন। ***কিন্তু ধর্মে বিবেকানন্দ এবং বিজ্ঞানে বসু পৃথিবীর জন্য দান রেখেছেন।"***

ব্রাহ্ম জগদীশ বোস ধীরে ধীরে সৃষ্টিতত্ত্বের গভীর কথাকে বিজ্ঞানের প্রমাণ সহযোগে প্রতিষ্ঠা করলেন। সর্ববস্তুতে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। প্রাণের পরশে প্রাণ পেয়েছিলেন জগদীশ বোস, নিবেদিতার সাহচর্য্যে, স্নেহে, সেবায়। জগৎজুড়ে প্রাণের লীলা প্রতিষ্ঠিত হল দুই মনীষীর যৌথ কর্মে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিজ্ঞানী বসুর উপলব্ধির যে বিবর্তন তাও আমরা লক্ষ্য করে অবাক হই।

মায়াবতী আশ্রমে নিবেদিতা ও বসু দম্পতি গিয়েছেন বেড়াতে। ১৯১১ সালের গ্রীষ্মকাল। সেখানে একমাস

থাকাকালীন নিবেদিতা ও বিজ্ঞানী বসু বিজ্ঞানের বই লেখার কাজ করে চলেছেন নিরলসভাবে। মিস ম্যাকলাউডকে ৪ জুলাই চিঠিতে জানাচ্ছেন নিবেদিতা—...মায়াবতীতে বসে বিজ্ঞানের মানুষটির নতুন বইয়ের ১২টি অধ্যায় শেষ করা গেছে—তার সমস্ত লেখার মধ্যে এ পর্যন্ত যা কঠিনতম। ড. বসু বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন আশ্রমবাসীদের কাছে। নিবেদিতাও তাঁর 'মনন সংস্কৃতি' বিষয়ে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে জ্ঞান-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মমূলক ও ধর্ম-সম্পর্কহীন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা ঠিক নয়। ধর্মজীবনের ক্ষেত্রেও জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে উপস্থিত কোনও তরুণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিরক্ষরতার কথা তোলেন। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা ১৯মে মিস ম্যাকলাউডকে যে চিঠি লেখেন সেটি থেকে বিজ্ঞানী বসুর ভিতরে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে যে গভীর উপলব্ধির কথা প্রকাশিত হয় তাও খুবই মূল্যবান। এই কারণে চিঠিতে লেখা যেতে পারে—

'গতকাল আশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ভাষণ দিতে হয়েছিল। ধর্ম-পথবর্তীদের পক্ষে সর্বোচ্চ জ্ঞানসাধনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলেছিলাম। তাতে তরুণদের কেউ কেউ ভড়ং করে বলল—শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষিত ছিলেন না। পরে খোকা বলল, ওকথা শুনে সে এতই রেগে গিয়েছিল যে, তার পক্ষে আত্ম-সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওরা কি উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, গঙ্গার ধারে দিনের পর দিন বসে এক হাতে মাটি, অন্য হাতে টাকা নিয়ে এ-হাত ও-হাত বদল করা এবং পরিশেষে দুটোকেই সমমূল্য জ্ঞান করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার অর্থ কি? ওই নির্বোধেরা কি অনুভব করতে পারে না, এর জন্য কতখানি মনঃশক্তির প্রয়োজন? ওরা কি মনে করে যে গণিত, গ্রীক, পদার্থতত্ত্ব বা ধর্ম—যাতেই প্রকাশিত হোক কোনো পার্থক্য হয়? ওরা কি দেখতে পায় না জ্ঞানের অভেদবোধই শিক্ষার মূল কথা?"

স্বামীজির মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নিবেদিতাকে ও ওলি বুলকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাধক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক অধ্যাত্মসাধকের শূন্যতায় কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন।

নিবেদিতাকে ডঃ বসু ৯ জুলাই, ১৯০২ লন্ডন থেকে লেখেন—

'কী নিদারুণ শূন্যতা এনে দিয়েছে এই মৃত্যু! মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কী সব বিরাট বিরাট কাজ সম্পন্ন হল! এই সমস্ত কিছু কিভাবে একজন মানুষ সম্ভব করল! আবার কিভাবে এখন সবকিছুর উপর স্তব্ধতা নেমেছে! কিন্তু তবু, যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন তার নিশ্চয়ই বিশ্রাম চাই। আমি এখনো যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, যেমন দু'বছর আগে প্যারিসে তাঁকে দেখেছি—সেই শক্তিধর পুরুষ—তাঁর বিরাট আশা—তাঁর মধ্যে সবকিছুই বিরাট—সন্দেহ নেই।'

ওলি বুলকে লেখা—

"হারিয়ে যায়নি কিছুই। যে-সকল চিন্তা, কর্ম, সেবা ও আশা সুমহান, তারা মূর্ত হয়ে থাকে তাদের উৎসভূমির ভিতরে ও বাহিরে। আমাদের সমগ্র জীবন কয়েকটি মহামুহূর্তের প্রতিধ্বনি—কালের মধ্যে যে-প্রতিধ্বনি চিরদিন অনুরণিত হয়।...সেই মহান আত্মা মুক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে তাঁর মহা বীরকর্ম এখন সমাপ্ত। মানুষ একলা কি করে ওই সকল-কিছু সম্ভব করল তা কি আমরা উপলব্ধি করতে পারব? যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে তাকে ঘুমোতে দাও, সেই ভাল। কিন্তু জানি, তাঁর কীর্তি, তাঁর শিক্ষা এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করবে—তাকে জাগিয়ে তুলবে—শক্তি দেবে।"

(১০)

বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর, ডঃ বসুর ৫৯তম জন্মদিনে। বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতীক নিবেদিতার প্রিয় বজ্র, মন্দিরভবনের উচ্চশীর্ষে স্থাপিত হল। তার নিচে নারী-দধীচি নিবেদিতার চিতাভস্ম প্রোথিত করলেন বিজ্ঞানী বোস, নিবেদিতার খোকা, মিসেস বুলের প্রিয় পুত্র। আর প্রবেশপথের দরজায় স্থাপন করলেন নিবেদিতার বাস-রিলিফ-lady of the lamp।

নিবেদিতার মৃত্যুর কুড়ি দিনের মধ্যে ডঃ বসু মিসেস উইলসনকে যে পত্র লেখেন, তার মধ্যে গ্রন্থরচনায় নিবেদিতার সাহায্যের বিষয়ে সমস্ত কথা এক লাইনে বলে নেওয়া হয়েছে : *"যে বইটি সে আমাকে লিখতে সাহায্য করছিল, তা আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে।"* সে বই নিয়ে অগ্রসর

হবার কোনো সামর্থ্য অবশিষ্ট নেই, একথা বলার পর ডঃ বসু বলছেন, "নিবেদিতা থাকলে কিন্তু এক দন্ড সময়ও নষ্ট হতে দিত না। তবে সে তো শরীরিণী নয়—সে মনোময়ী।"

নিবেদিতা তাঁর 'আচার্যদেব গ্রন্থে লিখেছেন—

'বেদান্তের তত্ত্বকথা তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কিছুই জানতেন না—কিছু না। তিনি যাপন করেছিলেন তাঁর মহান জীবন। তাকেই দান করে গেছেন। অন্যেরা ব্যাখ্যা করুক তাকে'—স্বামীজি তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রসঙ্গে একবার একথা বলেছিলেন। বিরাট জীবন যাঁরা যাপন করেন, তাঁদের কাছে স্বীয় জীবনের কোনো কোনো তাৎপর্য অজ্ঞাত থেকে যায়—এই সত্য স্বামীজির কথায় ফুটে উঠেছিল, এবং এই কথাগুলি স্বয়ং স্বামীজির জীবন আলোচনাকালে বারবার আমার মনে হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকার প্রতি আনুগত্য ঘোষণায় স্বামীজি সদাই সচেষ্ট ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিন্ন নিজস্ব কোনো ভাব বা বাণীর উচ্চারণ তাঁর কাছে অপরাধ বলে মনে হত।.....শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কোনো শাস্ত্র না পড়েই বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ—বিবেকানন্দও সেইভাবে মূর্তিমান জাতীয় জীবন। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি অসচেতন ছিলেন। গুরুর বিষয়ে যে কথা তিনি বলেছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও তাই বলা চলে: 'তিনি শুধু মহাজীবন যাপন করেই তৃপ্ত ছিলেন—অন্যেরা খুঁজে নিক তাঁর ব্যাখ্যা।

নিবেদিতার স্মৃতি নিয়ে মিসেস উইলসনকে জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি যেন রামকৃষ্ণের-বিবেকানন্দের নিবেদিতার মহাজীবনের এক মহান দিক ব্যাখ্যা করেন বিনম্র সশ্রদ্ধ ভাষায়—

"আমরা ১৩ তারিখটি (নিবেদিতার মৃত্যুদিন) উদ্‌যাপন করেছি, কিন্তু আগামীকাল হল (নিবেদিতার) জন্মদিন। ঐ দিনটি যখন স্মরণ করব, আমাদের মনে পড়ে যাবে, তাঁর আত্মা উত্থিত হয়েছে, বিরাজ করছে আমাদের মধ্যে। যে-শক্তি প্রতিদিন আমার মধ্যে জাগছে, যেভাবে আমি উত্তরোত্তর ভার বহন করে চলতে পারছি, য এককালে সুদূর স্বপ্নের বিষয় ছিল—এই সকলের মধ্য থেকে আমি ক্রমেই বুঝতে পারছি অমরতার যথার্থ অর্থ কী ? যদি আমি কাজ সমাপ্ত করতে পারি—সকলে বলছে কোনো একা মানুষের পক্ষে তা সম্পন্ন করা অসম্ভব—তাহলে সে সবকিছুই হবে আমাদের মধ্যে বিরাজিত জীবন্ত স্মৃতির শক্তিতে।...

বসু বিজ্ঞানমন্দির স্থাপত্যের দিক দিয়েও সুন্দর হবে। প্রবেশপথের বাম পার্শ্বে পাথরের বিরাট একটি পদ্ম—পদ্মটিই জলাধার, যার উপরে সত্যকার পদ্ম ফুটবে। তার উপরে রিলিফ মূর্তি, এক নারীর তাঁর হাতে জপমালা এবং প্রদীপ। এই বিজ্ঞানমন্দির তাঁরই প্রার্থনামূর্তি। ১৯ তারিখে চিতাভস্ম একটি আধারে করে পদ্মের ঠিক পাশে স্থাপন করা হয়েছে। দুটি প্রস্তরবেদী থাকবে, ঝুঁকে পড়বে একটি শেফালী গাছ, যা প্রতি সকালে ঝরিয়ে দেবে ক্ষুদ্র শুভ্র ফুলগুলি, মাটির উপরে বিছিয়ে যাবে ঘন আস্তরণ। এর বীজ তিনি এনেছিলেন অজন্তা গুহা থেকে, এবং বিদ্যালয়ভাবনে রোপণ করে যে-কয়েকটি চারা তৈরি করেছিলেন, তারই একটি এনে বসিয়েছি।"

সুপ্রিয়া রায়

মাদ্রাজ মহাজন সভায় নিবেদিতার বক্তৃতায় জগদীশ বসুর কথা

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি নিবেদিতা প্যারিস হয়ে জাহাজে আসার পথে ৩ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত-ও। মাদ্রাজের মহাজন সভা হলে ৪ ফেব্রুয়ারি সংবর্ধিত করা হয় দুজনকেই। ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত ওই সভায় নিবেদিতাপ্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ পুনর্মুদ্রিত হল।

"আমার জীবনের অবর্ণনীয় সৌভাগ্য, আমি আধুনিক ভারতের কয়েকজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। তাঁদের একজন (স্বামী বিবেকানন্দ) আপনাদের সুপরিচিত। তাঁর বিষয়ে বলা এখানে আমার কাজ নয়, কারণ কন্যা তার পিতার প্রশংসা বিশ্বজগতের সামনে করতে পারে না। এক্ষেত্রে সে মাত্র নিজ জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে—তাই হবে তার পক্ষে সর্বোচ্চ কাজ। ভারতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি (রমেশচন্দ্র দত্ত) সামনেই রয়েছেন, সাক্ষাতে তাঁর প্রশংসা করা অসৌজন্যকর। তাঁর কাজ এবং চরিত্র অনিবার্যভাবে যে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত করে—তাকে হৃদয়ের নীরব গহনে স্থাপিত রাখতেই হবে এক্ষেত্রে। আসুন, মাতৃভূমির অপর এক বিশ্বস্ত সন্তানের কথা বলি, যিনি বহুদূরে একাকী কাজ করে যাচ্ছেন, যাঁকে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে স্মরণ করা প্রয়োজন প্রতিদিনের প্রেমে ও প্রার্থনায়। আমি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর কথাই বলছি।

অপর যাঁদের উল্লেখ এইমাত্র করলাম, তাঁদের মতো ইনিও ভারতের পুরাতন জীবনের হৃদয়কেন্দ্র হতে উত্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে রক্ষণশীল এক অংশের ইনি গ্রাম-বালক। এঁর মা—সরলপ্রাণা সেইসব হিন্দুরমণীদের একজন, যাঁরা পরম মাধুর্যে, স্নিগ্ধতায় ও ত্যাগে পূর্ণ—যাঁদের নিয়েই হিন্দুজাতির গৌরব। এঁর পিতা—বাংলার এক লেফটন্যান্ট গভর্নর নিজের ডায়েরীতে একবার তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"আজ এমন একজন ভারতীয়ের সাক্ষাৎ পেলাম, যাঁর সমতুল আমি কখনো দেখিনি।" ডাঃ বসু তরুণ বয়সে এক বিশিষ্ট ইংরাজ বিজ্ঞান-শিক্ষকের কাছে পড়েছিলেন। তাঁর পত্নী আমাকে বলেছেন—বালকটি যখন ইংলন্ডে যাবে, তাঁর পিতা তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"বৎস, আমার যতখানি সামর্থ্য আমি তোমাকে ততদূর নিয়ে গেছি ; যদি তুমি আরও এগিয়ে যেতে চাও, যাও, সেখানেও আমার আশীর্বাদ পাবে।"

পিতা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতীতের সঙ্গে, রীতি-নীতি ও পরিবারের সঙ্গে, যে স্নেহবন্ধন হিন্দুকে জড়িয়ে রাখে, পারিপার্শ্বিক ও সমাজের যে বাঁধনে সে বাঁধা থাকে, তার গুরুভারের কথা যখন চিন্তা করি, এবং অপরদিকে দেখি, এই পূর্ণ অব্যাহতির ছবি—তখন মনে হয় যেন 'মুক্তি'-চেতনার সম্মুখীন হয়েছি আমরা, যে-জ্বলন্ত মুক্তি-বোধের কাছে পৃথিবীর অপর সকল জাতির স্বাধীনতা-বোধ নিতান্ত ম্লান। এই মুক্তির আদর্শই হিন্দুর সকল চিন্তায় প্রতিফলিত; যা-কিছু স্থানীয়, সীমাবদ্ধ এবং স্থূল, তাকেই এই আদর্শ বহুদূরে বিতাড়িত করে। ডাঃ বসুর বৈজ্ঞানিক জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। বস্তুজগতের অভেদ প্রতিপাদক তাঁর অধুনাতন বিরাট আবিষ্কারগুলির কথা আপনারা অনেকেই জানেন। তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহ উপস্থিত করেছেন। তাঁর কিছু গৌণ আবিষ্কারের কথাও আপনারা শুনেছেন। মার্কনির নাম শোনা যাবার আগেই তিনি কলকাতার এক বারান্দার মধ্য দিয়ে, এমনকি একবার জনৈক লেফটন্যান্ট-গভর্নরের দেহের মধ্য দিয়ে বেতারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন। আপনারা এও জানেন, যখন রন্টেজেন রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহল শিহরিত হয়ে উঠেছিল যখন জনৈক ভারতীয় আগন্তুক একই ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক এবং গভীর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। আর, সম্প্রতি আপনারা নিশ্চয়ই দৃষ্টি-রীতি, ফটোগ্রাফি-তত্ত্ব এবং এজাতীয় অন্যান্য জিনিস সম্বন্ধে অসাধারণ আবিষ্কারের কথা শুনেছেন। এই মানুষটি যেখানেই গিয়েছেন, ভারতের পতাকা বয়ে নিয়ে গিয়েছেন, আর সেই পতাকা প্রোথিত করেছেন বিজ্ঞান-অভিযানের একেবারে মুখাগ্রে।

এসব জিনিস সহজে করা যায় না, অনন্ত সংগ্রাম ছাড়া করা সম্ভব নয়। ফলাফলকে এক্ষেত্রে সংবর্ধিত করাই যথেষ্ট নয়। এইসব শক্তিধর সেবকের সাহস ও ভরসাকে রক্ষা করার দায়িত্ব জনগণকে গ্রহণ করতে হবে ; জনগণের নিরন্তর প্রেম ও সমাদর ওঁদের পাখায় বলাধান করবে।

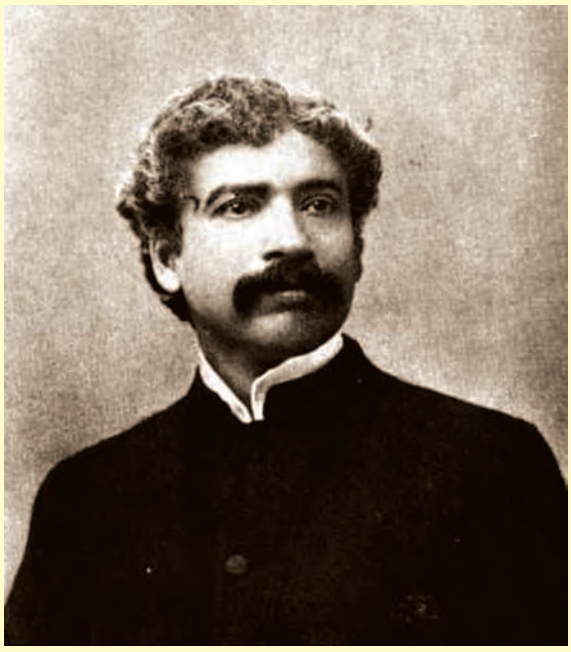

এই বিশেষ জীবনটির দিকে তাকিয়ে যখন আমরা নিজেদেরই প্রশ্ন করি—এজীবন এত বিরাট হল কিভাবে, কিভাবে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের জগতে অবতীর্ণ প্রথম ভারতীয় পুরুষটি এক ঝটকায় উঠে গেলেন একেবারে শিখরের উপরে—তখন আমার মনে তিনটি কারণের উদয় হয়।

প্রথমতঃ, ডঃ বসু এদেশ থেকে ছাত্ররূপে গিয়েছিলেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে। তাঁর পিতার আশীর্বাদ এমন একটি জিনিসের প্রতীক ছিল, যা প্রবেশ করেছিল অতি গভীরে। তিনি পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাধারার সম্মুখীন হবার সময়ে পাশ্চাত্ত্য স্বতঃসিদ্ধগুলিকে মেনে নিয়েছিলেন, যে-কোনো মূল্যে সত্যলাভ করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে আন্তরিকতার সঙ্গে সকল পূর্ব ধারণা ও সংস্কারের উচ্ছেদের চেষ্টা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, তিনি মতের ব্যাপারে একেবারে ধোয়া-মোছা শ্লেট নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন। শুধু মননের দিক দিয়ে যদি হয়, যে-কোনো হিন্দু এই স্বাধীনতাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বরণ করতে পারেন, এবং এখানকার অনেকে তা করেছেনও। কিন্তু ওই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে ভারতীয় পুরুষটির ভাগ্য তাঁকে এমন এক পরিস্থিতিতে স্থাপন করেছিল, যেখানে মনোজীবনকে তার সাধুতা বজায় রেখে বহির্জীবনের আচার-আচরণের সঙ্গে সুসঙ্গত হতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় যে উপাদান ডঃ বসুর জীবনের রূপ নির্ধারণ করেছিল, তা হল ছাত্ররূপে তাঁর কঠোর ও সর্বাত্মক পরিশ্রম। বিজ্ঞানকে নির্বাচন করার পরে যুবকটি যত প্রকারের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা সম্ভব, তাই করতে সচেষ্ট হয়েছিল, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, তড়িৎ-বিদ্যা, শরীরবিজ্ঞান সবকিছু। ভ্রান্তি ঘটল না কোথাও, প্রতিহত করতে পারল না কিছু। রণজিৎ সিং ক্রিকেট-জগতে যা করেছেন, বিজ্ঞানের জগতে তিনি তাই ঘটালেন—অভ্রান্ত পরিণতিতে পৌঁছাবার জন্য উভয়ক্ষেত্রে একই দুর্ধর্ষ আকাঙ্ক্ষা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পেশালাইজেশনের এই যুগে যে- ব্যাপক সংস্কৃতি তিনি অর্জন করেছিলেন, তার তুলনা বিরল। এখানে বলা উচিত, ঘটনাচক্রেই মাত্র তিনি পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ভারতে ফেরার পরেও তাঁর মনের রূপ বদলায়নি। একবার ফটোগ্রাফি ধরলেন, অন্য সময়ে ফনোগ্রাফ-রেকর্ড নিয়ে পড়লেন, ফল—অতীব চমৎকার এক 'সংগ্রহ।' যে-জিনিসই এই মানুষটি ধরুন—তাকে সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত ইনি সন্তুষ্ট নন। শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফ, শ্রেষ্ঠ রেকর্ড। পূর্ণতার জন্য এই উৎকণ্ঠা কি আদর্শ তপস্যা নয় ? তারপর—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতির অসামর্থ্য সম্বন্ধে নাক-সিঁটকানো অবজ্ঞার উত্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ঝলক—বিরাট ভারতীয়টি মিথ্যা প্রমাণ করলেন সকল অবিশ্বাসকে—বিখ্যাত হলেন নিজের সামর্থ্যে, কর্মে।

অধ্যাপক বসুর ভাগ্যক্ষেত্রের পরম সুবিধা অবশ্য তাঁর ভারতীয় জন্ম। এ পর্যন্ত আমরা অন্যান্যের সঙ্গে তাঁর কম বেশি সম-অবস্থার কথাই আলোচনা করছিলাম। যদি তিনি দেশকে সেবা করার আকাঙ্ক্ষাটুকু ছাড়া আর সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দায়মুক্ত স্বাধীন চিত্তে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তা অন্য কারণে নয়, পূর্ব-সিদ্ধান্তের বোঝা বইছে না, এমন সব পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে মানসিক সমভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যই। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাঁর প্রতিভা আছে—পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকরাও কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাঁদেরও প্রতিভা আছে। লর্ড কেলভিনের কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ১৪ বছর বয়সে ডিগ্রি এবং ঐ ধরনের ব্যাপার। সুতরাং এবার অধ্যাপক বসুর সঙ্গে অন্যান্যদের পার্থক্যের প্রসঙ্গে আসা দরকার—বলা দরকার, স্বদেশ ও স্বদেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি, যাঁরা ভারতের ঐতিহ্যকে নির্মাণ করেছেন সেই সরল সত্যসন্ধ মানুষগুলির প্রতি ভারতীয়রূপে তাঁর বিপুল ঋণের কথা।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ছাত্রগণ সৃষ্টির বিচিত্র ও বিভক্ত প্রকৃতিকে দেখাতে বদ্ধপরিকর, যার জন্য পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান নিরন্তর বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর পার্থক্য দেখানোই ওই বিজ্ঞানের ব্রত যেন। জড় ও চেতনকে পৃথক করছে কোন্ কোন্ জিনিস—সে সম্বন্ধে তার পুনঃ পুনঃ উদ্‌ভ্রান্ত প্রশ্ন।.....এক্ষেত্রে ভারতীয় পুরুষটির প্রতিক্রিয়া কি ধরনের ছিল? কেন তাঁর প্রতি রক্তবিন্দু ঐক্যবোধে স্পন্দিত হয়েছিল? বলা যায়, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, তড়িত তত্ত্বকে আলাদা আলাদা খাঁচায় অতি সাবধানে বন্ধ করে

রাখায় তাঁর কোনোই আগ্রহ ছিল না। সে কথা উক্ত বিখ্যাত ভারতীয় শুক্রবার সন্ধ্যায় সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্মেলনভূমি গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল ইনস্টিটিউটে কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন। তিনি বলেছেন—'ভারতে একটি বিজ্ঞানই আছে—সৃষ্টি-বিজ্ঞান—The Science of Nature।' তাই তিনি যখন দুই আপাত-পৃথক বিরাট সৃষ্টি-ধারার মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করেন, তখন তাতে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকের তুল্য বিভ্রান্ত বা তিক্ত-চিত্ত হন না—কেননা একে অভ্যর্থনা জানাবার যথেষ্ট অধিকার তাঁর আছে। রেখার মধ্যে রেখাকে, আয়তনের মধ্যে আয়তনকে, সমগ্রের মধ্যে সমগ্রকে তিনি সানন্দে নিমজ্জিত হতে দেখেন। সর্ব বস্তুর যে অদ্বৈত দর্শনে তাঁর চিত্ত পূর্ব থেকেই নিবিষ্ট, এ সকলই তাঁর পক্ষে নূতন প্রমাণ। এই ভাবের দ্বারা তিনি পরিবৃত হয়ে আছেন সমস্ত জীবন ধরে। অশিক্ষিত ভৃত্যেরা এবং সুশিক্ষিত বন্ধুরা, দোলনার জীবন থেকে বর্তমান জীবন পর্যন্ত সময়ে সবাই যেন এই কথাই যোগসাজশ করে তাঁকে শুনিয়েছে। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে একে তিনি পান করেছেন। মৃত্যুকেও যে তিনি দেখেন প্রত্যাবর্তনরূপে! এরই দ্বারা তিনি জাতীয় ভাবের সঙ্গে যুক্ত। সমগ্র জগৎ যদি পার্থক্য কল্পনা করেও, ভারতীয় হয়ে কিভাবে তিনি অদ্বৈতকে অনুভব করে পীড়িত হতে পারেন?

ভারতীয় ঐতিহ্যের আর একটি জিনিস বিজ্ঞানচর্চায় সমূহ সুবিধা সৃষ্টি করে, উৎকৃষ্ট ভাষায় যাকে বলা হয়েছে—"সন্ন্যাসী মন।" জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের এই পদ্ধতি দৈহিক শ্রান্তির ক্ষেত্রে মনঃসংযোগকে ব্যাহত হতে দেয় না। ভারতের ধর্মে কখনই ঈশ্বরকে 'শিক্ষা' করার কথা বলা হয়নি—ঈশ্বরকে জানতে বলা হয়েছে। মনকে সৎ-বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞানের চরিত্র, অনুমান, তথ্য-পরীক্ষা এবং যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের সঙ্গে নিতান্ত পৃথক। পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অনুমান ও তথ্য-যুক্তির পথ গ্রহণ করেন। গাণিতিক উন্নতি এই পথেই হয়েছে। কেবল ভারতীয় জনগণই কোনো ঘটনার পূর্ণ স্বরূপ অনুধাবন করার পরেই তাকে বিশ্লেষণ করে। এই মানস-সংস্থান লাভের উপযুক্ত শিক্ষাও সে পেয়েছে ; এবং এমন একটি সমাজ ও সভ্যতা ভারতের আছে, যা অন্তর্জগতের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের আদর্শে চালিত। এই সকল ব্যবস্থা থাকার জন্য এই পথে জ্ঞানলাভের শক্তি পৃথিবীর অন্য যে-কোনো স্থানের তুলনায় ভারতে সহজতর, এবং এর দ্বারা ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পথে অপরিসীম মূল্যবান জাতিগত প্রস্তুতির সুযোগ লাভ করে।

এই হেতু যখন আমি এই ভারতীয় পুরুষটিকে তাঁর সর্বশেষ সুমহান ঘোষণা—জড় ও চেতনের মধ্যে অব্যাহত প্রবাহের তত্ত্ব-ঘোষণার পক্ষে উদ্যত দেখি—তখন জানি, তাঁর সাফল্য তাঁর দেশেরই সাফল্য, তাঁর সংগ্রাম ভারতেরই সংগ্রাম, এবং তিনি—শতাব্দীর মধ্যে এক নিঃসঙ্গ আকার—যেন ভারতের নারী ও পুরুষের প্রতি মহা আহ্বান—যা বলছে, তারা যেন (অধ্যাপক গেডিসের ভাষায়) পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির ছাঁট-কাট না হয়ে আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে আচার্যরূপে প্রবেশ করতে পারে—মননের ক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে ভারতের সমশক্তি—নহে, কোন মতে নয়!—যেন ভারতের আধিপত্য তারা প্রমাণ করতে পারে সম্মানের সংঘাতে! এমনই একটি বিষয়ে আমি আপনাদের সকলের সমক্ষে অধ্যাপক বসুর বার্তাবাহী, যে-বার্তা ভবিষ্যতে উপযুক্ত অবসরে ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করব।

ভারতের বিরাট পুরুষেরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিরাট পুরুষদের তুলনায় কোনো অংশেই ন্যূন নন। গৌরব বোধ করুন তাঁদের নিয়ে, ভালবাসুন তাঁদের, সর্ব প্রাণ দিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করুন। তাঁদের জন্য কদাপি আপনাদের লজ্জিত হতে হবে না।

আর, ভারতীয় জন্মের গৌরব যিনি বৃদ্ধি করবেন, তাঁর জন্য আদর্শের মান উচ্চে রাখুন। প্রশ্ন করুন—তিনি কি সত্যের জন্যই সত্যকে চান—নাকি নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ? তাঁর হৃদয় কি উদার—একনিষ্ঠ ? তিনি কি চলার পথে অদম্য, অক্লান্ত ? জ্ঞানের জন্য এবং ন্যায়ের জন্য কি তাঁর তৃষ্ণা চির অতৃপ্ত, কামনা চির জাগ্রত?

যদি উত্তর হয় 'হাঁ', তাহলে, যাঁরা জাতি-আচারের একটিও কোনদিন ভাঙেননি তাঁদের তুলনায় ইনি অন্ততঃ কুড়ি গুণ বেশি ভারতীয়—যদি অবশ্য স্বদেশীয়ত্ব মাপার কোনো উপায় থাকে!

মহাশক্তিধর এই জাতি। শুধু সেই শক্তির স্বরূপ জানতে হবে এবং প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিজীবনে তাকে ব্যক্ত করতে হবে,—তা যদি হয়, কেউ ভারতের অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না। তাহলে মাকড়সার জালের মতো সকল সমস্যার জাল ছিন্ন হয়ে যাবে।

এবং—পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে যে চরম সত্য ঘোষণা করা ভারতবর্ষের নিয়তি, যদি কোনো পন্থা তার উপলব্ধি থেকে ভারতবর্ষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেই পথ সাময়িকভাবে যত লাভজনকই মনে হোক, তার দ্বারা ভারতের কোনই অগ্রগতি হবে না।

এই অসত্যের মধ্যে যে সত্যকে দর্শন করতে পারে, মৃত্যুর মধ্যে দেখতে পায় জীবনকে, নিত্য পরিবর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে দেখে পরম ঐক্যকে, চির শান্তি তারই মধ্যে—শুধু তারই মধ্যে—অন্য কোথাও নয়।

জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার চিঠি

ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব-এ 'নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র' অধ্যায়ের ২৭৩-২৭৭ পৃষ্ঠায় অনুবাদকৃত পত্রটি পুর্নমুদ্রিত হল।

৯, ইলিসিয়াম রো, কলিকাতা
১৮ এপ্রিল, ১৯০৩

প্রিয় মিঃ টেগোর,

অধ্যাপক বসু ঠিক ঠিক কি আবিষ্কার করেছেন এবং কোন্ অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে তাঁকে ঐসব আবিষ্কারের কাজ করতে হয়েছে, সে বিষয়ে বিবরণ লিখে পাঠাতে বলেছেন। মনে হয়, একটি চিঠির মধ্যে যতখানি লেখা যায়, সেই ধরনের বিবরণই আপনি চেয়েছেন। আরো ধরে নেওয়া যায়, এ চিঠি ব্যক্তিগত, তাই ভয় না রেখেই ইতস্ততঃ কোনো কোনো নামোল্লেখ করতে পারি, প্রকাশ্যে আমার লেখা উদ্ধৃত হবে না, এই বিশ্বাসে।

কলকাতায় আসার পরে আমি অধ্যাপক বসু ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে। মহা আতঙ্কিত হয়ে তখন দেখেছিলাম, ওই রকম বিরাট বিজ্ঞানকর্মীকে কি ধরনের ধারাবাহিক অসুবিধা ও উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়, এবং সেইসব অসুবিধা ও উৎপীড়ন ঘটাচ্ছেন তাঁরাই যাঁদের একান্ত ইচ্ছা তাঁর কৃতিত্বের অবসান হোক, কারণ ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাছে গাত্রদাহকর। গবেষণার সময় যাতে তিনি না পান তার জন্য কলেজ-রুটিন যতখানি সম্ভব শ্রমসাধ্য করা হয়েছিল, এবং সামান্য যা-কিছুই ঘটুক না কেন, তার জঘন্য কদর্থ করা ও বিরক্তিকর চিঠি লেখালেখিতে তাঁকে বাধ্য করা হত।

এসব জিনিস আপনার চোখে সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু যে-কাজের জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যাপক ও ধারাবাহিক ভাবাবেগের প্রয়োজন হয়, সেখানে স্বাধীনতা ও শান্তির কতখানি প্রয়োজন সে বিষয়ে যদি আপনার কোনো ধারণা থাকে (তা অবশ্যই আপনার কাছে), তাহলে নিশ্চয় বুঝবেন, আমাদের বন্ধু যে, কাজ করে যেতে পেরেছেন এবং পারিপার্শ্বিকের ঐ চেহারা সত্ত্বেও সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন—কী অপূর্ব ব্যাপার তা ! আমেরিকান বা ইংরেজ, ফরাসী বা জার্মানদের মতো স্বাধীন দেশের লোকেরা ডঃ বসুর তুল্য বৈজ্ঞানিককে স্বজাতির মধ্যে পাবার জন্য সানন্দে যেখানে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে, সেখানে ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ হওয়া সত্ত্বেও ওহেন বিরাট বৈজ্ঞানিককে একেবারে একাকী কাজ করতে হচ্ছে—স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম এই দৃশ্যে! আমি তখন ইউরোপ থেকে সবে এসেছি ; খনিজদ্রব্য ভেদ করে

যায়, এমন ঈথার-তরঙ্গের আবিষ্কারক-রূপে সেখানে তাঁর নাম সুপরিচিত। ইউরোপে তাঁর কাজের সংবাদ বিলম্বে পৌঁছেছিল। রন্টেজেন রশ্মির সঙ্গেই তাঁর আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর আবিষ্কার আরও গভীরে প্রবেশে সমর্থ, কারণ রন্টেজেন রশ্মি অস্থি ও ধাতুতে প্রতিহত হয় কিন্তু এর আবিষ্কার তাদের ভেদ করে যায়। যতদূর মনে হয়, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই তিনি কলকাতার টাউন হলে ঐ অদৃশ্য রশ্মির অস্তিত্ব যন্ত্রযোগে প্রমাণ করেছিলেন, এবং তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের দু'বছর পরে, ইটালীর কিছু বৈজ্ঞানিক কাগজে দেখা যায়, মার্কনি ওই রশ্মিকে ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন।

আপনি অবশ্যই বুঝবেন যে, বিজ্ঞান জগতে মার্কনি, টেসলা, ম্যাসিন ধরনের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকদের স্থান ডঃ বসুর মতো সন্ন্যাসী-মনের সন্ধানীদের তুলনায় অনেক নিম্নে। সন্ধানীদের কাছে জ্ঞানই একমাত্র লক্ষ্য, জ্ঞানের জন্যই তাঁরা জ্ঞানের অন্বেষণ করেন। এমন কি অধ্যাপক (অমুক) পর্যন্ত পেটেন্ট নিয়ে, বাণিজ্যিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের বিরাট সুনামের ক্ষতি করেছেন, যাতে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যাই হোক, ডঃ বসু এই বিশেষ ঈথার-তরঙ্গের অস্তিত্বই কেবল প্রদর্শন করেননি, গবেষণার বিরাটত্বের মতোই তিনি নির্মাণের ক্ষেত্রেও বিরাটত্ব দেখিয়েছেন,—'কৃত্রিম চক্ষু' নামে পরিচিত তাঁর যন্ত্রটি সরল ও সংহত রূপের জন্য অত্যাশ্চর্য বস্তু বলে গৃহীত হয়েছে। প্রিন্স ক্রপটকিন বলছিলেন, অধ্যাপক টমসন এক সপ্তাহ আগে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে আলোকের পোলারাইজার-এর কাজ করছে এমন একটি কয়েক গজ দীর্ঘ যন্ত্র দেখালেন,—পরের সপ্তাহে ডঃ বসু সেই একই কাজ করলেন, অন্য কিছুর দ্বারা নয়, কেবল একখানি বই তুলে নিয়ে দেখালেন, (ঘটনাচক্রে সেটি একটি ব্রাড্‌শ!) কিভাবে রশ্মি এক দিক দিয়ে যাবে, অন্য দিক দিয়ে নয়। প্রিন্স ক্রপটকিন বললেন—"আমি নিজের মনে বললুম, এই হল সর্বোচ্চ প্রতিভার যোগ্য সহজতা।" ডঃ বসুর পদ্ধতি যে এমন আশ্চর্যরকম সহজ হতে পেরেছে, তার মূল কারণ অবশ্য—তাঁর থিয়োরী সমক্ষেত্রের ইংরাজ ও জার্মান প্রতিযোগীদের তুলনায় বহুগুণে উন্নত।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আমার বিশ্বাস তিনি রয়্যাল সোসাইটি মারফত পেপার প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে সর্ববিধ অসুবিধার মধ্যে কাজ করেও প্রতি বছর দুটি কি তিনটি পেপার প্রকাশ করে গেছেন—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে যাওয়া পর্যন্ত এই রকমই চলে। (সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি যদি ২ বৎসরে একটি পেপার প্রকাশ করতে পারেন, সেটা উত্তম কীর্তিরূপে গৃহীত হয়!) আবার অধ্যাপক বসুর কাজ প্রতি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণভাবে মৌলিক এবং এক বিশেষ অর্থে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসম্পন্ন। একটি আশঙ্কায় তিনি সর্বদা তাড়িত হয়েছেন—যদি কোনো একটি ক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হন, তাহলে উচ্চ শিক্ষায় তাঁর দেশবাসীর কোনো অধিকার নেই—তাই যেন প্রমাণিত হয়ে যাবে! লন্ডনে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন রোগশয্যায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন, সেই সঙ্গে সর্বশেষ আবিষ্কারসমূহকে প্রকাশের লড়াইও চলছে, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন—"সবাই জানে আমাদের অপূর্ব কল্পনাশক্তি রয়েছে, কিন্তু আমাকে অধিকন্তু প্রমাণ করতে হবে, নিখুঁত কাজের ক্ষমতা এবং নাছোড় লেগে থাকার ক্ষমতাও আমাদের আছে।" তা তিনি সত্যই প্রমাণ করেছিলেন। লর্ড র‍্যালে এবং স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্, উভয়েই তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর পদ্ধতি যে নিখুঁত, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না, এবং তিনি ১৮৯৫-৯৬-তে যে এক্সপেরিমেন্ট দেখিয়েছেন, ১৯০১ সালেও তার পুনঃসম্পাদন করতে আর কেউ সমর্থ হল না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষতা বটে !

১৮৯৪ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়ের কাজ : অদৃশ্য আলোক-পোলারাইজেশনের উপর ডজনখানেক কি তারও বেশি স্বতন্ত্র অনুসন্ধান। 'Dark cross'-এর অস্তিত্ব প্রমাণ ও অন্যান্য মূল্যবান কাজ—ইউরোপের অগ্রসর কর্মীদের কাছে বহুল ইঙ্গিতসূচক—যাঁরা এ'র থিয়োরী এবং যন্ত্রাদি থেকে সূত্র গ্রহণে বিলম্ব করেননি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কিন্তু স্পষ্টতঃ এইসকল বিচ্ছিন্ন কাজগুলি বিরাট এক সাধারণীকৃত রূপের অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করে, যার সর্বাঙ্গসম্পন্ন রূপকে এখনো জগতের গোচর করা হয়নি, যখন করা হবে তখন থেকে উত্তরোত্তর তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর দর্শনগত আগ্রহের সৃষ্টি করবে।

'Stress and Strain'—এর বিরাট থিয়োরীর ইঙ্গিতই আমি এখানে করছি। একে প্রকাশ করার মতো সময় এবং সামর্থ্য যদি তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন, তাহলে তা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মতোই যুগান্তকারী আবিষ্কার হবে—পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতের যোগ্য উপহার হবে তা।

এই ব্যাপক সত্যের গৌণ প্রয়োগই ইতিমধ্যে প্রভূত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে— এর সূত্রে প্রথম যে আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তা হল—'Binocular Alternation of Vision'. আর একটি অধিকতর ব্যবহারগত (অর্থাৎ ব্যবসায়িক) আবিষ্কার ঘটিয়েছে—বেতার সংকেতের গ্রাহকযন্ত্রের উন্নতি ; লজ্-এর সহযোগী ডঃ মুরহেড খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন, এই পদ্ধতির ক্রমোন্নত যে ব্যবহার ইদানীং ভারতে করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ডঃ বসুর পেপারগুলি ও কথাবার্তা থেকে তাঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত লাভ করেছেন। এই থিয়োরীর বৃহত্তম প্রয়োগ অবশ্য খাঁটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই। ফটোগ্রাফির মধ্যে, রসায়নের মধ্যে এবং 'Molecular Physics'-এর মধ্যে যে আপাত বৈষম্যের রূপ রয়েছে, তার রহস্যসূত্র এর মধ্যে থেকেই পাওয়া যায়। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, এর থেকে 'Vegetable Response' নামক ব্যাপারের আবিষ্কার ও সূত্র নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। ডঃ বসুর এই মতবাদ, এইসব ক্ষেত্রের নানা ছোটখাট হবু থিয়োরীকারদের অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করেছে, এবং সেইজন্যই যে-সব শারীর-তাত্ত্বিক প্রাণের অনন্য স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে ব্যস্ত, তাঁদের তরফ থেকে কঠোর বিরোধিতা করা হয়েছে। এই বিরোধিতা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। এবং সাধারণতঃ এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই বৈজ্ঞানিক নিজের বিরাটত্ব প্রমাণ

করেন, এবং বিরোধিতার সঙ্গে প্রচণ্ড জাতিবিদ্বেষও যুক্ত হয়েছে ; এবং আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, এইসব লোকই ইন্ডিয়া অফিসে তদ্বির করে ডঃ বসুর ডেপুটেশন-বৃদ্ধির প্রস্তাব রদ করেছেন, ঠিক সেই সময়টিতে, যখন ডঃ বসুর মত প্রচারিত ও পরিজ্ঞাত হতে আরম্ভ করেছে এবং তাঁর বই প্রকাশিত হয়নি।

যে-বিশেষ লোকটিকে আমি সন্দেহ করি তিনিই নভেম্বর মাসে ডঃ বসু ভারতে আছেন জেনে (যাঁকে যথার্থতঃ জোর করে ভারতে পাঠান হয়েছিল) তাঁর কিছু আবিষ্কার চুরি করেন ও নিজের নামে প্রকাশ করেন। সৌভাগ্যের বিষয়, বিজ্ঞান জগতে ডঃ বসুর নাম এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এর দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ঐ ব্যক্তি ছোট একটি দল গঠনে সমর্থ হয়েছেন ; তবু যদি উপযুক্তভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বিশ্বাস করি সহজেই তাদের তুচ্ছ করে দেওয়া যাবে।

Response in Living and Non-living বইটির এখন জয়জয়কার। কিন্তু আমি আরও অনেক বড় কাজ চাই—যা কেবল এই ভারতের বৈজ্ঞানিকই লিখতে সমর্থ, সে বই হবে 'Molecular Physics'-এর উপরে, তার মধ্যে ভারতের যে-বিরাট মন উপনিষদের যুগে সকল মানবজ্ঞানকে পরিক্রমণ করে তাকে অদ্বৈত বলে ঘোষণা করেছিল, সেই মনই ঊনবিংশ শতাব্দী যে-বিরাট বস্তু-পুঞ্জকে সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করেছে, তাকে পুনশ্চ দর্শন করে, নিছক অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী, যন্ত্র উপাসক, স্বর্ণ-শিকারী পাশ্চাত্ত্যের কাছে পুনরায় ঘোষণা করবে—বহুরূপে প্রতিভাত এই বস্তুসত্য মূলে সেই এক—অদ্বৈত।

কিন্তু বুঝতে পারি, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-ধরনের একটা কাজ আরম্ভ করার অনুরোধ পর্যন্ত করা যায় না। পূর্ণ সহানুভূতি এবং সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার যেখানে একান্ত প্রয়োজন, সেখানে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, যেহেতু চাকুরিয়া অতএব ব্যতিব্যস্ত করা কাজের দায়, অন্নসংস্থানের নিত্য চিন্তা, ক্ষুদ্র ঈর্ষার উপরে ওঠার ক্ষমতা নেই এমন সামান্য আমলাদের সৃষ্টি-করা নানা অসুবিধা,—এও কি যথেষ্ট নয় ? তথাপি আমরা তাঁকে বিরাট কাজে হাত দেবার অনুরোধ করি ! কিন্তু তাঁর জন্য কতখানি করতে প্রস্তুত আমরা ? আমরা কি তাঁকে এমন জ্ঞান-সঙ্গী দান করতে পারি, যিনি প্রেরণা দিয়ে এই কঠোর শ্রমসাধ্য কাজে উৎসাহিত করবেন ? একথা কি আমরা কখনো গভীরভাবে ভেবেছি যে, বর্তমান ভারতে একমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীর কাজে লিপ্ত আছেন, এবং তা সত্ত্বেও তাঁর পদে কাজ করতে রাজি হবে এমন যে-কোনো ইংরেজের, অতি সাধারণ ইংরেজের চেয়েও তিনি কম মাইনে পান ?

লন্ডনের ডাঃ গারনেট আমাকে ভিয়েনার সুমহান বিজ্ঞান-কলেজের বিরাট জাঁক-জমকের কথা বলেছিলেন।

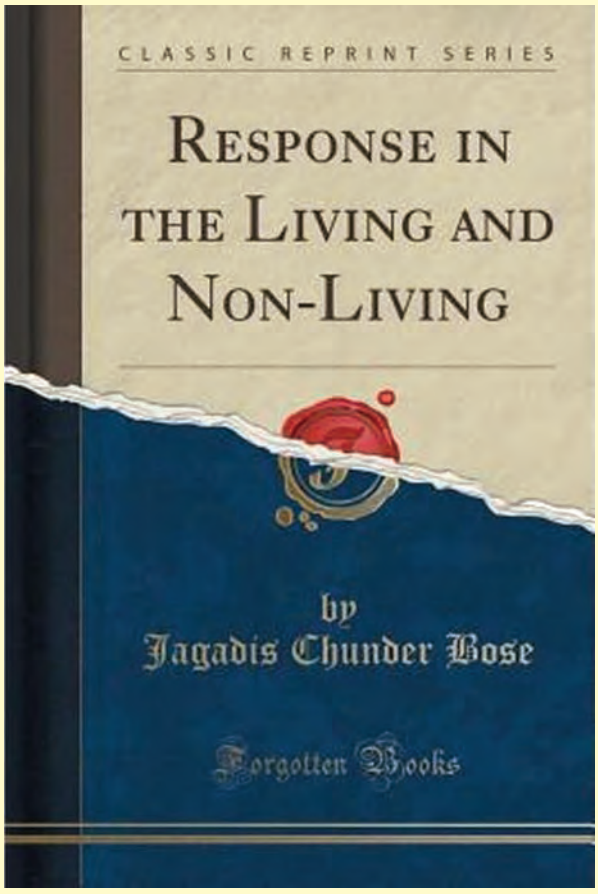

সেই দেখে, তিনি যখন সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, কী বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার !—তখন সরকারি প্রতিনিধি সগর্বে বলেছিলেন, যদি এখান থেকে সারা শতাব্দীতে একজন যথার্থ বৈজ্ঞানিকও জন্মান, তাহলে তার তুলনায় এই সমস্ত ব্যয় সামান্যই। আমাদের মধ্যে এমন কথা বলবার মতো কে আছেন ?

ভারত ! হে ভারত ! তুমি কি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ একটি সন্তানকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে পারো না, যা তাকে বিশ্রাম দেবে না, ঠেলে দেবে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমারই জন্য সংগ্রাম করতে— যেখানে আগুন জ্বলছে লেলিহান, পাগল হয়েছে সংঘাত, এবং ঘর্মে ও শ্বাসে চলেছে দারুণ প্রয়াস। হে ভারত, যদি তুমি তা করতে না পারো—যদি তুমি নিজ সন্তানকে পর্যন্ত আশীর্বাদ করে সজ্জিত আকারে রণক্ষেত্রে পাঠাতে অসমর্থ হও—তাহলে এই বড় অসুখী অথচ বড় ভালবাসার দেশটির আসন্ন সর্বনাশ বিলম্বিত হোক, স্তব্ধ হোক নিয়তির সমুদ্যত বজ্র—তা বলবার কি কোনো অধিকার আমাদের থাকবে ? *

প্রিয় মিঃ টেগোর খুবই অসম্পূর্ণ এই কথাগুলি। কিন্তু ইতিমধ্যেই নোট বইয়ের অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যবহার করেছি, সুতরাং এখানে চিঠি শেষ করতেই হচ্ছে।

আপনার চির বিশ্বস্ত—
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

বসু বিজ্ঞান মন্দির

TOOLS USED FOR MAKING
INSTRUMENTS DURING THE
TIME OF ACHARYA J C BOSE
LATHE

PART
OF A
PROJECTOR

HAND
GENERATOR

মার্গারেট থেকে নিবেদিতা

২০১৭ সালের ১২ নভেম্বর, উইম্বলডনে ভগিনী নিবেদিতার পারিবারিক আবাসগৃহে 'হেরিটেজ ফলক' উন্মোচন অনুষ্ঠানের পর মার্টন আর্টস স্পেস এবং লাইব্রেরিতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিবেদিতা সংক্রান্ত পুস্তিকার উদ্‌বোধন করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্গারেটের বয়স তখন ১৩-ও হয়নি। ভাই রিচমন্ড ৩ ছাড়িয়েছে। স্বামীহীন মায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না ছেলেটির দেখভালের দায়িত্ব নেওয়া। আর্থিক সংকট এতটাই বেশি ছিল, ঠিক হয় আয়ারল্যান্ডে দাদামশায়ের কাছে রিচমন্ডকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। স্কুলের ছাত্রী দিদি মার্গারেটই তাকে ওখানে পৌঁছে দেয়। অস্পষ্ট স্মৃতির আবেগঘন মুহূর্তটি কখনো ভোলেননি রিচমন্ড। এই হৃদয় ছোঁয়া বর্ণনাটি পরবর্তী কালের নিবেদিতাকে বোঝার জন্য খুবই মূল্যবান। রিচমন্ড লিখছেন—*খুব অস্পষ্টভাবে একটি জাহাজের কথা মনে পড়ে, আর জাহাজী নীল রঙের পোষাক পরা একটি বালিকাকে, যে আমাকে ভোলাচ্ছিল। এই ঘটনাটির আকর্ষণ এইখানে—এর মধ্যে-আমার বোনের সাহস আত্মনির্ভরতার ইঙ্গিত আছে, যে দুটি গুণ পরবর্তীকালে তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াবে। স্থলপথে এবং সমুদ্রপথে একটি অবুঝ শিশুকে নিয়ে যাওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেও সহজ কাজ নয়—সে তো নিতান্ত বালিকা।*

মার্গারেটের মা মেরী ইসাবেল হ্যামিল্টন। জন্ম ১৮৪৫-এ। মাত্র চার বছর বয়সে মাতৃহারা হন। আয়ারল্যান্ডের বহু বছরের বাস এঁদের পরিবারের। এই ধনী পরিবারটির মূল মন্ত্র ছিল— 'ফুঁড়ে এগিয়ে যাও।' মার্গারেটের দাদামশায় ছিলেন রাজনীতিতে উৎসাহী। ছয় ভাইবোনের মধ্যে সবথেকে বড়ো মার্গারেট। সবচেয়ে ছোটো রিচমন্ড। তিন মাস বয়সে রিচমন্ডের পিতৃবিয়োগ ঘটল। জীবিত এখন দুই দিদি। অর্থাৎ ছয়ের মধ্যে বাকি তিনজন নেই।

১৮৪৩ এ মার্গারেটের বাবা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল-এর জন্ম। দাদু জন নোবল। ঠাকুরমা এলিজাবেথ নীলাস, এয়োদশ শতাব্দী থেকে আয়ারল্যান্ডে এঁদের বসবাস। ৪০ এর জন আর ১৮-এর নীলাস প্রেমে পড়লেন। আত্মহারা প্রেম পরিণতি পেল বিয়েতে। কিন্তু নিঃসম্বল অবস্থায় পরিবার থেকে বিতাড়িত। প্রায় সতেরো বছরের বিবাহিত জীবন। জন নিলেন পাদরী-র পেশা। উত্তর আয়াল্যান্ডের এক প্যারিশ থেকে আরেক প্যারিশে বদল হতে লাগলেন ওয়েসলিয়ান চার্চের এই পাদরী। এগারোটি সন্তানের মধ্যে ছ'টি সন্তান রেখে মারা গেলেন তিনি। এলিজাবেথ তখন পয়ত্রিশের প্রৌঢ়া। ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন রক্ষণশীল দলের প্রখ্যাত রাজনীতিক। এ হেন ঠাকুমার কাছেই মার্গারেট বড়ো হয়েছেন চার বছর বয়স পর্যন্ত।

এ হেন মায়েরই ছেলে মার্গারেটের বাবা। আকর্ষক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কবি, সুবক্তা। স্ত্রী ইসাবেলার সাহচর্যে কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে বেছে নিলেন বাবার মতোই পাদরীর জীবন। তবে ওয়েসলিয়ান চার্চে নয়। পরাধীন আয়ারল্যান্ড হয়ে উঠেছিল অসহনীয়। চলে গেলেন ম্যাঞ্চেষ্টারে। শুরু করলেন লেখাপড়া। শুরু হল কষ্টের ও কৃচ্ছতার জীবন। বাগ্মীতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ম্যাঞ্চেস্টারে কন্‌গ্রিগেশনালিস্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। আক্রান্ত হলেন যক্ষ্মায়। রাজনীতিতে অতি উৎসাহী। 'ভিকার' হয়ে চললেন ওল্ডহ্যামে। গরীব শ্রমিকদের শহর। সকাল ৬টা বাজলেই কাঠের জুতো পায়ে শ্রমিকরা চলত কারখানার পথে। সেই শ্বাসরোধী আবহওয়ায়, অতিরিক্ত পারিশ্রমে স্যামুয়েল 'যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলেন।

ওল্ডহ্যাম থেকে অসুস্থ মানুষটিকে সপরিবারে পাঠানো হল গ্রেট টরিংটন-এ। গাছে ঘেরা ডেভনশায়ারের মনোরম একটি গ্রাম। পুরোনো দুর্গ প্রাসাদের গায়ে চড়ে বেড়াত বনময়ূরীর দল। সকলেই খুশী হল এখানে আসতে পেরে। মার্গারেটের বোন মিসেস উইলসন এর লেখায় পাই সেই সময়ের মন ছোঁয়া এক বর্ণনা—পরিবারের আর্থিক কষ্ট অত্যধিক। পিতার জীবনের জন্য প্রয়োজন ছিল মনোযোগের, ভাল খাওয়া-দাওয়ার— যার দাম অনেক। তিনি চেয়ে দেখতেন— তিনিন চলে যাচ্ছেন— শিশু সন্তানদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তাঁর পত্নী। মার্গট চেঁচিয়ে বাইবেল পড়ত—বাবার বইগুলি খোঁজ করে ঠিকঠাক রাখত। বাবার সঙ্গে তাঁর নৈকট্য ছিল খুবই। দীর্ঘ কথাবার্তা হত। ভারতবর্ষের কথা হত। বালিকা বয়সে নিবেদিতা ভাবত, বড় হলে সে ভারতবর্ষে যাবে। সেবাকে বিরাট আদর্শরূপে নিয়েছিল, উদারনৈতিক রাজনীতির বড় মাথা ছিলেন স্যামুয়েল নোবল। কলেজের ছাত্ররা এসে জুটতেন তাঁর কাছে। ঘর বন্ধ করে চলত আলোচনা। আলোচনা ভেসে আসত শিশু মার্গারেটের কানে।

চার্চের মধ্যেই খেলাধূলা করতো তিন বোন—মার্গারেট, মেরী (মে) ও অ্যান। 'প্যাস্টর' সাজত মার্গারেট। বেদী থেকে বক্তৃতা দিত। দর্শক ও শ্রোতা বাকি দুই বোন। চলত গান, প্রার্থনা, অভিনয়।

প্রতি রবিবার চার্চে যাওয়ার অভ্যাস আর গল্প শোনার। মায়ের কাছে বিকেলের পর বাইবেল শুনতো, মা অভিনয় করেও দেখাতেন। রাজনীতি ও ধর্মকে মিশিয়ে দিতেন, তাতে প্রচুর কল্পনা যোগ করতেন। ইজিপ্টের জ্বালা যন্ত্রণা বা আয়ারল্যান্ডের নবজাগরণ প্রভৃতির কথা শুনে শিশুদের চুল খাড়া হয়ে উঠতো। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে লাফিয়ে যেতেন, ইচ্ছামত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চলতেন—যাতে সন্তানের মনে রঙ ধরে যেত।

মে-র এই স্মৃতিচারণ থেকে আমরা খুঁজে নিতে পারি মার্গারেটের পাপড়ি মেলার প্রেক্ষাপটটিকে।

জন্মের কিছুদিন পরেই বাড়ির আইরিশ কাজের মেয়ে ম্যাগি তাকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে 'ব্যাপটাইজ' করে নিয়ে আসে।

এই ঘটনা তাঁর পরবর্তী জীবনের সঙ্গে একটা যোগসূত্র তৈরি করে রাখে।

মে লিখেছেন—হ্যালিফ্যাক্সে আমাদের স্কুলে পড়ার সময়ে বুধবার বিকেলে প্রান্তর ভ্রমণ: ঝোপঝাড়, লতাগুচ্ছ, কন্টকগুল্ম, কালোজামের গাছ, বন্য গোলাপ, ব্লু-বেল প্রভৃতি।

অর্থাৎ প্রকৃতিমগ্নতা এইভাবেই তাঁর স্বভাবজ হয়ে পড়ে। মে বলছেন—নিবেদিতা মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়েছে প্রধানত বনের ফুলের উপর। স্কুলে থাকাকালে নিবেদিতার উপর 'ব্রিদরেন অব প্লিমাউথে'র প্রভাব পড়ে। এগারো বছর বয়সে প্রতিক্রিয়া ঘটে। ১২ থেকে ১৩-র মধ্যে ক্যাথলিক ভাবকে আবিষ্কার করল বইপত্র দেখে।

হৃদয়বত্তায় সন্ধানী 'বর্ণরাগের' তাই ক্যাথলিক ভাবে আকৃষ্ট। স্কুল, এইভাবের বিরোধী সুতরাং একে সে লুকিয়ে রাখত। মা পরে তাকে তার ক্যাথলিক ব্যাপটিজমের কথা বলেছিলেন। সেজন্য সে ঐ মতে আরও উৎসাহী হয়। এর শিল্প সৌন্দর্যে সে বিশেষ আসক্ত।

মে-র লেখা থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে তিনি সঙ্গীত প্রভৃতি ভালবাসতেন। উদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষ আগ্রহী।

বক্তৃতা করা, ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলায় বিশেষভাবে পারদর্শী। বই পড়তে ভালবাসতেন। আর যেন 'সব সময়েই শিক্ষাবিৎ'।

১৮৮৪ থেকে ১৮৯৭—স্কুল ছাড়ার পর থেকেই এই বছরগুলিতে তিনি বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন।

১৮৮৪ থেকে ১৮৮৬ কেসউহকে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে গভর্নেস থাকাকালীন ওখানকার প্রধান শিক্ষিকা মিস চিভলির দ্বারা 'হাই চার্চ'-এর প্রভাবে পড়ার ফলে তিনি রোমান ক্যাথলিক প্রভাব থেকে মুক্ত হন। চার্চ অব ইংল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের যে বিয়ে করা উচিত নয় একথা মিস চ্যাভলই তাঁকে বোঝান।

১৮৮৬-তে র‍্যাগবিতে কুড়িটি শিশুর অনাথ আশ্রমের একটি ছোট দাতব্য বিদ্যালয়ে পড়াতে যান।

১৮৮৭-৮৯ নর্থ ওয়েলসের রেক্সহ্যাম কয়লাখনি অঞ্চলে একটি বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তারপর দু বছর চেস্টারের একটি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৮৯১ থেকে ১৮৯৪ উইম্বলডনে বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী মাদাম ডি লিটের সঙ্গে নিজের স্কুল তৈরির সংগ্রাম চালান। মাদাম আমেরিকায় চলে যান বড়ো চাকরি পেয়ে।

মার্গারেট এবার একেবারে নিজের একটি স্কুল শুরু করেন, উইম্বলডনেই। দুটিই ছিল কিন্ডারগার্টেন স্কুল। পরের স্কুলটায় ৪০টি শিশু ছিল বলে জানা যাচ্ছে। ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই ঠিক হয়ে যায় তাঁর ভারতে আসার পরিকল্পনা। এই স্কুলটির ভার দিয়ে আসেন বোন মে-কে।

মে-র কথা থেকে তাঁর অসাধারণ শিক্ষাদর্শন-এর বীজ ধরা পড়ে। মার্গারেট বলতেন—শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, সে যাতে শিক্ষা খুঁজে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

নিবেদিতা স্কুলে 'বীরপূজা' শেখাত বলে জানা যাচ্ছে।

ভাই রিচমন্ড নোবল জামাইকায় যাজক হিসেবে কাজ করতেন। দিদি-অন্ত প্রাণ এই ভাইটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন—মার্গারেটের সঙ্গেই আমার আদিতম স্মৃতি জড়িত।

রিচমন্ড তাঁর জীবনে, বিশেষ করে মনোবিকাশের ক্ষেত্রে মার্গারেটের প্রবল প্রভাবের কথা বলেছেন। মার্গারেটের শেক্সপীয়রের নাটকীয় বক্তৃতার 'হৃদয়গ্রাহী' আবৃত্তির কথা তিনি স্পষ্ট মনে করতে পারতেন।

তিনি লিখেছেন—তার ধ্বনিময় কণ্ঠের, "for Brutus is an honorable man" এখনো আমার কানে , সুস্পষ্ট বাজছে। যেন আজ সকালেই তা শুনেছি। আমি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকতুম।

বোন মে–র স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় ১৮৯১তে ছুটির সময় দিদি মার্গারেটের সঙ্গে লিভারপুলে থাকতেন,

রোটান্ডোয় যাওয়ার ট্রেনের ভাড়ার পয়সা না থাকায় দু'জনেই হাঁটতেন, মার্গারেট সারাটা পথ আবৃত্তি করতেন।

দিদি মার্গারেট ভাইকে উৎসাহ দিতেন শেক্সপিয়রের নাটক পড়তে, দিদিই তাঁকে পয়সা দিয়েছিলেন শেক্সপীয়রের নাটক দেখতে। তিনি 'কিং হেনরি দি এইটথ্' এবং 'টুয়েলথ নাইট' দেখেছিলেন। আর্ভিং বা এডা রেহানের অভিনয় দেখেও তাঁর মনে হয়েছিল—'কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কেউই মার্গারেটের তুল্য তীব্র শক্তিতে শেক্সপীয়ারের লাইনগুলি বলতে পারেননি।'

রিচমন্ডের স্মৃতিচারণা থেকে মার্গারেট সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। কারণ এই ভাইটি গভীরভাবে দিদিকে বোঝার চেষ্টা করতেন।

নিজ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আত্মবিকাশে মানুষের নিঃসংশয় অধিকার ঘোষণার উদ্দেশ্যে মার্গারেট সর্বদাই ছিলেন উজ্জীবিত আর এই উদ্দেশ্যের অভিমুখে তাঁর জীবনের দুটি প্রবণতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল—বিপুল ধর্মানুভূতি এবং প্রবল প্রগাঢ় জাতীয়তা। দিদিকে খুব গভীরভাবে জানাতেন বলেই ভাইয়ের এই পর্যবেক্ষণ।

পারিবারিক নিবেদিতা চিরকালই আন্তরিক এবং দায়িত্বপরায়ণ। অল্প বয়সে স্বামীহারা মা কত কষ্ট করেই না বড়ো করেছেন মার্গারেটদের। দুশ্চিন্তা আর পরিশ্রম তাঁর সঙ্গী ছিল।

নিবেদিতা বড়ো হতেই দায়িত্ব নিলেন পরিবারের। কিন্তু বেশিদিন নয়। পাড়ি জমালেন অন্য জীবনে।

যেন অন্য জন্ম তাঁর।

কিন্তু বাধা দেননি মেরী। নিবেদিতার মা

মিস ম্যাকলাউডকে তিনি বলেছেন এর আসল কারণ। প্রথম সন্তানের জন্মের সময় এতটাই শঙ্কিত ছিলেন যে মনে মনে বলেছিলেন সুস্থ শিশু জন্মালে দেবতার উদ্দেশ্যেই তাঁকে তিনি 'উৎসর্গ' বা (নিবেদন) করবেন। এমনকি মার্গারেটের বাবাও মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে বলে যান কন্যা যদি ধর্মের জন্য আত্মদান করতে চায়, তাকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। বোন মে লিখছেন— *মার্গট সব সবসময়ই এমন একজনের সন্ধান করত, যিনি তার চেয়ে বড় চরিত্রের হবেন। বিবেকানন্দের মধ্যে সেই চরিত্র পেয়েছিল। স্বামীজির কাছে তার যোগদানের উচিত্যের বিষয়ে আমরা কখনো প্রশ্ন তুলিনি। নিবেদিতা তার আহ্বান পেয়েছিল। উপলব্ধির পথে অগ্রসর তার জীবন। ...নিবেদিতা বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়নি। সে সত্যের সন্ধানী। বিবেকানন্দ ছিলেন সত্য— যার সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছিলাম।*

নিবেদিতা যখন বিবেকানন্দর সাক্ষাৎ পেল, তারপর থেকে তার পক্ষে রোমান ক্যাথলিক বা অন্য কোনো অনুসন্ধানে আস্থা রাখা সম্ভব হয়নি।

বোন মে দিদি মার্গারেট (নিবেদিতা) সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে মা লিখেছেন, যা বলেছেন তা আমাদের নিবেদিতার প্রতি সশ্রদ্ধ আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

তিনি লিখছেন— *সে যখন স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেল, ন্যায্য প্রতিরোধের পরে যখন স্বামীজির মূল্য ও আন্তরিকতার সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয় হলো, তখন চমৎকৃত হয়ে দেখল, ইতিমধ্যেই ভারতের নারীদের জন্য কাজের প্রবল আগ্রহে হৃদয় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। সে অনুভব করল যে তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ এই উদ্দেশ্যের পথেই তাকে চালিত করেছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্বশক্তি নিয়ে। যত প্রকারে সম্ভব, ভারতীয় নারীদের কাছে এই সত্যটি প্রতিভাত করতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল, তাদের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে এবং তারা যাতে নিজেদের সাহায্য নিজেরাই করতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত উপাদান তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াও তার ব্রত হয়ে দাঁড়াল।*

'মার্গারেট' ভারতে এসে 'নিবেদিতা' হলেন। বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্য-এ দীক্ষিত করলেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতা বিভিন্ন ঘটনায় বারবার এর গূঢ় কারণ উপলব্ধি করেছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গুরু-র কথা স্মরণ করেছেন।

১৮৯৯-র ৯ই মার্চ তারিখে নেল হ্যামন্ডকে লেখা একটি চিঠিতে নিবেদিতা বলছেন— *নেল, তুমি জানো যে, নিজের পরিবার সম্বন্ধে আমার হৃদয়হীনতার ভাবটি আমি কত অনুভব করি। কিন্তু আমরা এত পৃথক হয়ে পড়েছি যে এইসব কথা (শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি ভক্তির কথা) কী করে তাদের বলব? আমার সমস্ত হৃদয় এই নূতন ধর্মীয় আকর্ষণে যেভাবে গ্রথিত হয়েছে সে বিষয়ে তাদের কিছু বলতে সাহস করি না।*

তার তিনদিন পর মিস ম্যাকলউডকে লিখেছেন— *"তুমিই এঁকে (সারদাদেবীকে) মা বলে ডাকতে শিখিয়েছ—আমার ছেড়ে আসা ছোট্ট মায়ের দাবির সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের একটা টানাটানি ছিলই।"*

এক মানুষ কিন্তু দুটি সত্তা—মার্গারেট ও নিবেদিতা। দীর্ঘ টানাপোড়েনে মার্গারেট 'নিবেদিতা' হয়ে উঠেছে। নানা চিঠিপত্রে ছড়ানো রয়েছে এই টানাপোড়েনের অসাধারণ বুনন।

কালীতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে যখন নিবেদিতা এর মুখ্য প্রচারক তখনও চিত্ত নানা আশঙ্কায় দুলছে। সুদূর ইংলন্ডে-এ খবর পৌঁছলে মায়ের মনে আঘাত কতটা লাগবে, প্রিয় বোনের বিয়ে ভেঙে যাবে না তো— কত না শঙ্কা!

কিন্তু সব আশঙ্কা দূর হয়ে গেল স্বামীজির উপস্থিতিতে। ১৮৯৯-এ স্বামীজি আবার গেলেন পাশ্চাত্যে। নিবেদিতার পরিবারে কাটালেন কয়েকটা দিন।

আশ্বস্ত নিবেদিতা ১২ আগস্ট লিখছেন—'নিম-এর (বোনের) প্রণয়ী আচার্যদেবের চরণে নতজানু হয়েছিল, যেমন হয়েছিল মা, নিম ও রিচ। অপরূপ।

পরবর্তীকালে ২২ মার্চ,১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নিবেদিতা লিখছেন—

আমাদের বাড়ির সবকিছু যেন ভারতের জন্যই উৎসর্গীকৃত।.....বিশ্বাস করি, আমার ভাইও একদিন স্বামীজির সন্তান হয়ে দাঁড়াবে, তবে মা বেঁচে থাকতে তা হবে না বলেই মনে হয়।

লিখছেন— *"তুমি জানো, স্বামীজি তাকে ডাক দেবেন বলেছিলেন, কেবল ভেবেছিলেন, মাকে দুটি সন্তান থেকে বঞ্চিত করা অপরাধ; অথচ আমার প্রিয় ছোট্ট মা-টি কখনই অভিযোগ করতেন না আমি জানি।"*

১৮৯১-এ স্বামীজির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নিবেদিতার মায়ের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। ধর্ম ত্যাগ না করেও স্বামীজির উদার আধ্যাত্মিকতা তাকে নতুন করে জাগায়।

নিবেদিতার বাবার বরাবরই ভারত সম্পর্কে আগ্রহ ছিল যা ছোটো থেকেই চারিয়ে যায় নিবেদিতার মধ্যে। নিবেদিতার মায়েরও ব্যাপারটা অজানা ছিল না। কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পর 'ভারতবাসীর জন্য তাঁর দ্বার খুলে গিয়েছিল।' বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে সস্ত্রীক তাঁদের বাড়িতে থাকবার জন্য বলেন।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মিসেস ওলিবুলকে লেখা চিঠিতে মায়ের সম্পর্কে যা বলেছেন সেখানেও দেখা যাচ্ছে

মায়ের জন্য তিনি যা ভাবছেন ও যেভাবে ভাবছেন তার মূল কত গভীরে প্রোথিত। তাঁর মাকে সকলে ভালবাসেন এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা করেন। মাও ব্যস্ত হয়ে পড়েন সেই প্রত্যাশা পূরণে। ফল হয় অত্যন্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়া। তাঁকে বোঝানো যায় না কাজের কাল তাঁর শেষ হয়েছে এবং তাঁর সাহায্যের দরকার নেই কারোর। বরং তিনি উল্টো বুঝে কষ্ট পান। নিজেকে মনে করেন বোঝা এবং ভাবেন যেতে পারলেই মঙ্গল।

নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে লিখছেন—*এখনই প্রথম আমি হিন্দু ভাব ও রীতির সৌন্দর্য ও মর্যাদার রূপ বুঝতে পারছি; মানুষের সত্যকার বাঁচার জীবন তো এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। মানুষের বিষয়ে মার যা ধারণা, ঈশ্বরের বিষয়েও তাই—ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে সেবা ও বন্দনা চান.....মা তাই অনুভব করতে পারেন না—ঈশ্বরকে শুধু ভালবেসে যাওয়াই একমাত্র কাজ হতে পারে। এই অপর দিকটি শুধু বোঝানো যায় না; তবু বিশ্বাস করি, যেভাবেই হোক, তা মায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হবে।.....*

তিনি লিখেছেন—*স্বামীজিকে কোনো খবরাখবর দিই নি, এই ব্যাপারটিকে তুমি যদি অদ্ভুত মনে করো, তার উত্তর—আমি স্বামীজিকে জানাতে চাই—'আমি মা এর সঙ্গে বাস করতে গিয়েছি এবং কিছু সময়ের জন্য এমন কি তাঁর (স্বামীজির) বিষয়েও ভাবতে চাই না।'* তাঁর পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুলসহ অনেকেই সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। নিবেদিতাও থাকতেন চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর বৃদ্ধ মায়ের নিঃসঙ্গতা দূর করে তাঁকে প্রাণময়তায় ভরিয়ে রাখতেন।

১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হচ্ছে পাঁচ বছর পর। আত্মীয় ও বন্ধুদের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন—মাটির প্রদীপ, ধূপ, ধূপদানী, নানা রকমের কবচ, পাথরের নুড়ি, ছোট ছোট বেতের বাক্স, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার ক্ষুদ্র পট, বোতলে গঙ্গাজল।

নভেম্বরের দশ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন—*বাড়ি ফিরতে কী সুখ। কী আনন্দ! যেখানে স্নিগ্ধতম আত্মাটি বিরাজ করছে। মা তার নিজের রাজ্যে মাধুর্যে, সাহায্যে, সেবার পূর্ণ 'প্রতিটি জিনিস এখানে অপরূপ সুন্দর।' ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় গেলেন নিবেদিতা ১৯০৯-এর জানুয়ারি। খবর গেল—মা শেষ শয্যায়।*

কাজ ফেলে ছুটে এলেন নিবেদিতা।

৩০ জানুয়ারি মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন—

"গত মঙ্গলবার সকালে মা মারা গেছেন—তখন নিম আর আমি শুধু ছিলাম তাঁর কাছে। আমি চাপাস্বরে বললাম, 'হরি ওঁ!'—যাতে তাঁর কানে সেই হয় শেষ শব্দ! ঈশ্বরের করুণার শেষ নেই—ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম। বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, এখন তিনি যাচ্ছেন 'পূর্ণ তৃপ্তি' নিয়ে। ২৪ ঘণ্টা একত্র ছিলাম আমরা, আমি দেখলাম—তাঁর সমস্ত আত্মা ফিরল পরজীবনের দিকে। শুক্রবার সকাল থেকে মোটামুটি সারাক্ষণ ওষুধে নিঃঝুম ছিলেন।

শেষ যে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা তিনি বলেছিলেন, তা হল 'ভারতীয় মৃত্যু' হচ্ছে আমার। আমরা ভাবলাম, তিনি অগ্নিসৎকার চাইছেন যা পূর্বেও চেয়েছেন। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তাঁর সে ইচ্ছা পালিত হল। আমাদের পরিবারকে যাজক সৎকারমন্ত্র পড়লেন—আহা, কী সুন্দর ভাবে। একমাত্র এই পরিবর্তন করেছিলেন—

'Commit her body to the fire, in the sure and certain hope of the resurrection of the body.'

এর শরীর অর্পিত হোক অগ্নিতে, এই স্থির-নিশ্চিত প্রত্যাশায়—পুনরুত্থিত হবে দেহখানি।

কী আনন্দ হল শুনে, কারণ ঐ অর্থে তিনি ইতিমধ্যেই পুনরুত্থিত হয়েছেন; যে-'দেহবস্ত্রখানি' আমরা সরিয়ে দিলাম, তার সঙ্গে (পুনরুত্থানের) ওই দেহের কোনোই সম্পর্ক নেই।

তাঁকে হারিয়ে কত না হারিয়েছি। তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আর কিছু চাইবার হেতু নেই। এখন একমাত্র কাজ, যত দ্রুত ও নীরবে সম্ভব

ভারতে ফিরে যাওয়া। বুঝতেও পারিনি কতখানি গুরুত্ব নিয়ে তিনি জীবনের ক্ষেত্রে বর্তমান ছিলেন! এখন দেখছি, তাঁর উপস্থিতি কত জিনিসের মূলে। কিন্তু তিনি প্রিয় ছোট্ট মা-টি আমার, তাঁর দ্বিতীয় বিবাহদিন পেয়েছিলেন। কী সুখী, একেবারে শিশুর মতো—নিশ্চয় এখন তাই হয়ে উঠেছেন! কত উদার ছিলেন, প্রেমে পূর্ণ নিঃস্বার্থপর। এখন তিনি এমন সত্তালোকে পৌঁছেছেন, যেখানে বিরাট প্রেমের তরঙ্গ তাঁর উপর ভেঙে পড়বে, উন্নীত করবে তাঁকে, স্থাপন করবে সমুচ্চ তরঙ্গচূড়ে।

পুণ্য! পুণ্য! পুণ্যপ্রাণ! শুধু এইটুকুই বলতে পারি।"

মিসেস ওলি বুলকে ৪ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে লিখছেন—

শেষ সন্ধ্যায়, শেষের শিহর যখন দেখলাম, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করলাম—একে তুলে নাও করুণা করে, যত শীঘ্র সম্ভব, মধ্যরাত্রির আগেই। তারপরে ভাবলাম, প্রার্থনা তো করেছি, এখন আর কিছু চাওয়া উচিত নয়, তাঁদের কাছে বা অন্য কারো কাছে; অপরপক্ষে 'পরম বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যাশা' করতে হবে—যা-কিছু শ্রেয় বলে স্থির করবেন, তাকেই বরণ করতে হবে।

মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস উইলসন (নিবেদিতার বোন মে)।

সকালে যখন তাঁর কাছে গেলাম, দেখি শ্বাসরীতির পরিবর্তন হয়েছে। নিম বলল, পাঁচটা নাগাদ এমন হতে শুরু হয়েছে।

প্রাতরাশে গেলাম, যদিও মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যাওয়া কঠিন ছিল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম, তৎক্ষণাৎ নিমকে ডাকলাম।

কিন্তু আর্নেস্ট যতক্ষণ না গিয়েছে এবং নিম আর আমি শুধু তার কাছে আছি, ততক্ষণ মৃত্যুলক্ষণ দেখা দেয়নি। তারপর শেষের শুরু। আহা—তিনি যা চেয়েছিলেন, ঠিক সেই জিনিসটি সর্বাংশে, একেবারে আক্ষরিকভাবে যেন ঘটে গেল! বলে সেকথা বোঝানো যাবে না।

আমি সাক্ষাৎ অনুভব করলাম—স্বামীজি এসেছেন—এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দ্বার তিনি নিজে উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। আমি চাপা স্বরে বললাম—'হরি ওঁ!'—যেন তাঁর কানে পৃথিবীর শেষ শব্দ হয় ঐগুলিই ! এত স্তব্ধ-গভীর আমরা, এত সুগম্ভীর, মৃত্যুর অপূর্ব নিরোধের তীব্রতা আমাদের এতই অভিভূত করে ফেলল যে, চোখের জল বা তেমন সব-কিছু আবেগ স্তম্ভিত হয়ে রইল, ছেয়ে গেল অনুপম শান্তি আর আনন্দে, ঊর্ধ্বলোকের বস্তু যা—সারাদিনের জন্য।"

বাবার সমাধিতে গিয়ে মায়ের ভস্ম স্থাপন করে এলেন ডেভনশায়ারে গিয়ে ১৯০৯এর ৫ এপ্রিল।

পারিবারিক দায় কখনই এড়াতে পারেননি ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা। তাঁর স্কুলের দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন বোন মে-কে। এর জন্য তাঁর মনে ছিল চূড়ান্ত অশান্তি। মে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।

১৮৯৯-র ৩০ জানুয়ারি ম্যাকলাউডকে লিখছেন একটা বিচিত্র কথা বলার আছে

মিসেস ওলি বুল এবং মিস ম্যাকলাউড এই সমস্যার সমাধানে হাত বাড়ালেন।

বোনের বিয়ে ঠিক হল। স্কুলের ও কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েছিল হয়ত। বিয়েতে ম্যাকলাউডের দেওয়া সাদা সিল্কের গাউন পড়ে 'মেড অব অনার' হয়েছিলেন নিবেদিতা।

৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ তারিখে মে-র বিয়ে হল। আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই স্বামীজিসহ ইংলন্ডে পৌছে যান নিবেদিতা। নিম অর্থাৎ মে স্বামীজির জন্য উইম্বডনেই স্টেশনের কাছে মনোরম পরিবেশে ঘর খুঁজে দিয়েছেন।

নিবেদিতার 'তৃপ্তি' ঝরে পড়ছে সেই সময়ের নানা পত্রে।

ওই সালের ২১ জুলাইএর চিঠিতে ম্যাকলাউডকে আগেই লিখেছেন— নিমের বিয়ের দিন থেকে আমি সবকিছু পরিহারের ব্রত নেব। ভরসা করি এ জীবনে আর কখনো আমার জন্য নতুন গাউন তৈরি করার দরকার হবে না।

ছোট বোনের সুখী দাম্পত্য জীবন কত বড়ো ছিল দিদি মার্গারেটের কাছে, ভাবলে অবাক হতে হয়।

১৯০৩ থেকে ১৯০৫-র মধ্যে দুই বোনের চিঠিতে যে মধুর সম্পর্ক ধরা পড়েছে দিদি নিবেদিতা-র চিঠি থেকে তা স্পষ্ট।

নিবেদিতার পাঠানো ছবি দেখে চিন্তিত বোনকে আশ্বস্ত করছেন দিদি। লিখছেন— *...এখন আমি আবার বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠেছি।*

কখনও বোন টাকা পাঠাচ্ছেন দিদিকে। দিদি লিখছেন— পরের মঙ্গলবার সরস্বতী পূজা—*আমাদের ভারতীয় মিনার্ভা দেবী, এবং ৫০টি দরিদ্র বিধবা ভরণপোষণের কিছু টাকা পাবে—তোমার টাকা তাতেই যাবে।*

বিধবাদের পক্ষে ভিখারী হওয়া সম্ভব নয়, তাঁরা ক্ষয়িষ্ণু ভদ্রনারী, ঠিক সেই শ্রেণির মানুষ যাদের সাহায্য করা তোমার পছন্দ হবে।

১৯০৪-এর ১১ আগস্ট লিখছেন বোনকে— *"আমার আর্থিক অবস্থা নিয়ে তুমি কখনো ব্যস্ত হয়ো না যেন—তা কখনই দুঃখজনক নয়। মানুষ সামনের দিকে অল্পই দেখতে পায়, কিন্তু আলো সব সময়ই আসে—যখন আমরা কাজ করে এগিয়ে যাই। ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুবই আমোদজনক। সহৃদয়তার সঙ্গে যে-সব আমন্ত্রণের চাপ আমাকে দেওয়া হয়েছে, যদি সেগুলিকে গ্রহণ করতাম, তাহলে তুমি শুনতে যে, আমি এখন মিশরে আছি, তারপরে ইতালীতে, পুনশ্চ আমেরিকায়। বাল্যে কত না চেয়েছি ইতালী ও মিশর দেখতে, আর তারপরে বেঁচে থেকে সেই দুই জায়গা দেখার আমন্ত্রণ চিন্তামাত্র না করে প্রত্যাখান করতে পেরেছি!! সুতরাং মনে রেখো, সব সময়েই আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, ভারতেই আমি স্বচ্ছন্দে সুখে বাস করতে পারি—আহা, কত সুখে! আমার তো মনে হয়, যদি এক পেনিও না থাকে—সেই হল খাঁটি আদর্শ। আমার টাকা চাই—কাজের জন্যই। এবং সে সম্বন্ধে ভাবতে চাই—দায়িত্ব আমাদের নয়, ঈশ্বরের।"*

দিদির জন্মদিনে বোন কেক পাঠাচ্ছেন। দার্জিলিঙে বসুদের সঙ্গে একত্রে কেক খাওয়া হচ্ছে। স্বামীজির মৃত্যুর পর থেকে বসু পরিবারেরই সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

ভাই রিচের জন্যও ছিল তাঁর অনেক আশা। মে-র কথা থেকে জানতে পারি, নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল রিচ ভারতের জন্য জীবনোৎসর্গ করবে। নিবেদিতা তাকে কৃষিবিদ্যা পড়ায়। ১৯০৩-র আগস্টে মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন।

ভাই চিঠি লিখছেন দিদিকে পাশে থাকার কথা জানিয়ে। দিদির জন্য উদ্বেগ এবং সম্ভাব্য বিপদের ভাবনায় ভাই বিচলিত। এই চিঠিটি বুঝিয়ে দেয় রিচের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

"অতিবড় ভালবাসার মার্গট, বারে বারে ফিরে আসুক এই সুখের দিনটি! এই বছর তোমাকে অভিনন্দন জানানোর মস্ত কারণ ঘটেছে। প্রথমতঃ তুমি এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করেছ (দি ওয়েব বই), যা ভারতে তোমার কাজের স্থায়ী কীর্তিস্তম্ভ। দ্বিতীয়তঃ তোমার বই ভালই চলেছে। যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের কাছে এই দুটি জিনিস অতীব তৃপ্তিকর। চিরদিন তুমি কাজ চালিয়ে যেতে পার, এই আমার হৃদয়ের একান্ত অভিপ্রায়। কিন্তু এরও বেশি কিছু তোমাকে চাই—তোমার পিছনে দাঁড়াতে পারে এমন একটি মানুষ। আমি চাই, তুমি বোঝো যে—আমি সেই মানুষ। তোমার পাশে আমি আছি। ভারতে যদি তোমার উপর উৎপীড়ন হয়, তাহলে অগ্রণী আইরিশ নেতাদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে আমার এতই প্রভাব আছে যাতে তোমাকে যারা অভিযুক্ত করতে চায়, তাদের কাছে ব্যাপারটা নিতান্ত অসুবিধাজনক করে তুলতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, যে ব্যক্তি তোমাকে পীড়িত করতে চায়, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক—ব্যক্তিগত শত্রুতার। আইরিশ রীতি তুমি জানো—আমার কথার অর্থ তুমি বুঝবে। ব্যাপারটা চরম শোনাচ্ছে, তবু তোমাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি, যথাসম্ভব রক্ষণাবেক্ষণ তোমার দরকার। তোমার সাহস যেন হারায় না—এগিয়ে যাও!

রিচ এক ধনী কন্যাকে বিয়ের কথা ভাবছে শুনে দিদি চিন্তিত। দীর্ঘদিন তিনি দুশ্চিন্তা করেছেন এই নিয়ে। ভয়ে থেকেছেন— মা কষ্ট পান। মায়ের সঙ্গে রিচের বিচ্ছেদ ঘটেছে। এইসব পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে ম্যাকলাউডকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিঠিতে তাঁর নির্দেশ দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য পারিবারিক শান্তি ও মর্যাদা রক্ষা করা।

ভাই-এর সম্পর্কে তিনি লিখছেন চিঠিতে 'দারিদ্র্য মস্ত জিনিস, তার গর্ব যেন সে অনুভব করে।'

রিচ অবশেষে চাকরি পেয়েছে। সেই সংবাদে মিসেস বুলকে নিবেদিতা লিখছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—তাঁরা রিচকে সবসময়ে নিজেদের আশ্রয়ে রেখেছেন। আমি জানি, জানি তা।

১৯১১-র ১৩ অক্টোবর মায়ের মৃত্যুর পর তিন বছরও কাটেনি নিবেদিতার 'জীবনদীপ' নিভে গেল, দার্জিলিঙে পাহাড়ের কোলে। তাঁরও ভস্মাবশেষ পাঠানো হল ডেভনশায়ারের পাইনঘেরা সেই স্থানে বাবার সমাধির পাশে যেখানে মায়ের চিতাভস্ম সমাহিত করে এসেছিলেন একসময়। ১৯১২র ১২ অক্টোবর।

সুরা

নিবেদিতা সম্পর্কে লেডি অবলা বসু

নিবেদিতার মৃত্যুর সময়ে পাশে ছিলেন লেডি অবলা বসু। তাঁর সুদীর্ঘ স্মৃতিচারণে ধরা পড়েছে নিবেদিতার জীবনের কয়েকটি দিক। স্মৃতিচারণাটি নিবেদিতাকে জানা ও বোঝার জন্য অপরিহার্য এই স্মৃতিচারণটি প্রকাশিত হল।

এখন থেকে ঠিক তের বছর আগে একজন ইংরাজ রমণী, বয়সে তরুণী, স্বাস্থ্যের আর তেজের প্রতিচ্ছবি, উৎসাহে জ্বলন্ত মুখখানি—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন: তিনি আমাদের নারীসমাজের সেবা করতে চান, বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে, আর সেইজন্য যাদের সেবা তিনি করতে চান তাদের জীবনযাত্রা বরণ করবেন, ঠিক তাদেরই একজন হয়ে যাবেন।

আরও অনেক দিন পরে, যখন আমি তাঁর বন্ধুত্বের পুণ্য গৌরব পেলাম, তখনই ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলাম মার্গারেট-ই-নোবলের জীবনের আধারে রয়েছে কী শক্তি ! সে কী না পুণ্য আশিস্ তিনি সহস্রধারে বর্ষণ করতেন তাঁর সঙ্গধন্যদের উপর। কতদিকে তিনি আমাদের মাতৃভূমির প্রত্যক্ষ সক্রিয় সেবা করেছেন, সে কথা আজ এত শীঘ্র আমরা বলে উঠতে পারব না। এখানে আমি শুধু আমাকে যা এত অভিভূত করেছে, সেই তাঁর সুন্দর জীবনের দু'একটি আলোকরেখাকে অবারিত করছি।

তাঁর এমন জীবন, এ কোনো আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। তাঁর পিতা ইংরাজ ধর্মযাজক, বাগ্মী—জীবনের বিরাট সাফল্য-সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়ে, তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে তরুণ বয়সে ম্যাঞ্চেস্টারের দরিদ্রদের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। পিতা ও পুত্রীর মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা। পিতার বন্ধুদের একজন ভারতে ধর্মপ্রচারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন তিনি দেখা করতে এসে বন্ধুকন্যাটির শিশুমুখে সুগভীর আধ্যাত্মিক আবেগ লক্ষ্য করে আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন, একদিন ভারতের ডাক তোমার কানে পৌঁছবে। দৈববাণীর মতো কথাগুলি, সত্য-বাণীর মতো তা সফল হয়েছিল। পিতাও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তরুণী পত্নীকে বলে যান, ভবিষ্যতে একদিন তাঁদের শিশুকন্যার কাছে মহান্ আহ্বান আসবে, সেদিন জননী যেন তাঁর কন্যার পাশে সমর্থন নিয়ে দাঁড়ান। তিনি প্রথম থেকে এইভাবেই উৎসর্গীকৃতা। তাই যখন আহ্বান সত্যই এল, তখন মায়ের প্রাণ যদিও বিচ্ছেদ-বেদনায় মথিত, তবু তাঁর লোকান্তরিত স্বামীর স্মৃতি তাঁকে শক্তি দিয়েছিল। এরপর থেকে তাঁর কন্যার ভক্তি-ভুবন ভারতবর্ষ তাঁরও শ্রদ্ধাতীর্থ ; তাঁর উইম্বলডনের গৃহখানিতে

ভারতীয়রা সর্বসময় তাদের নিজস্ব ঘরখানি খুঁজে পেত।

শিশুকন্যাটির মধ্যে ক্রমে বিরল মনস্বিতার বিকাশ ঘটল। হাক্সলি পর্যন্ত তাঁর বুদ্ধিশক্তিতে চমৎকৃত হলেন। কালক্রমে তিনি বিরাট একটি শিক্ষা-আন্দোলনের কেন্দ্রচরিত্র হয়ে দাঁড়ালেন। এই আন্দোলনের অন্যতম পরিণতি বিখ্যাত 'সীসেম ক্লাব'। তাঁর অপূর্ব মনস্বিতার জন্য যখন লন্ডন শহরে তাঁর সামনে বিরাট ভবিষ্যতের দ্বার খুলে গেছে, ঠিক তখনি ভারতের ডাক তাঁর কাছে পৌঁছল। স্বামী বিবেকানন্দ তখন লন্ডনে প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। প্রাচ্যের সেই বাণীতে তিনি সাড়া দিলেন। আজীবন সেবার ব্রত ধারণ করে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন অনতিবিলম্বে।

লেডি অবলা বসু

তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতে আমি কিন্তু আমাদের রক্ষণশীল ভগিনীদের মধ্যে তাঁর শিক্ষা-প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভরসা বোধ করতে পারিনি। এর কয়েক মাস পরে তিনি আমাকে তাঁর বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়িতে আহ্বান জানালেন। সেখানে গিয়ে চমৎকৃত। তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। রক্ষণশীল পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাড়ি নিয়েছিলেন বলে প্রথমে কোনো হিন্দু ভৃত্য তাঁর কাজ নেয় নি। তিনিও প্রতিবেশীদের ভাবে আঘাত করার চেয়ে বিনা চাকরেই রইলেন। কতবার হয়েছে, রান্না করা সম্ভব হয়নি, শুধু ফল খেয়ে কিংবা কোনো সহৃদয় প্রতিবেশী যা পাঠিয়েছেন, তাই খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। কিছুদিন পরে সেই প্রতিবেশীরাই তাঁকে এমন আপন জন বলে মনে করল যে এমন কি সবচেয়ে রক্ষণশীল অথচ শ্রেষ্ঠা তাপসী নারীও* তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করতে পেরে খুশী হলেন।

সে এক অপরূপ কাহিনী—কিভাবে তিনি ধীরে ধীরে, ধৈর্যশান্ত প্রেমের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করলেন ! প্রথমে এল পাড়ার শিশুর দল। তাদের নিয়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল। শিশুর মায়েরাও বেশীদিন সরে থাকতে পারলেন না, তাঁরাও এলেন। তাঁদের পড়ানোর পৃথক ব্যবস্থা হল। অনাথা আর বিধবারা, তাঁর কাছে সর্বদা পেত সহানুভূতি ও সেবার প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ হৃদয়ের আশ্রয়। শিক্ষয়িত্রী করে তোলার ইচ্ছা নিয়ে তাদের তিনি শিক্ষা দিতেন।

এইভাবে রক্ষণশীল সমাজের বুকের মধ্যে 'ভগিনী নিবাস'-এর প্রতিষ্ঠা ঘটল। ভারতে তাঁর এই কাজ এমন ব্যাপক স্বীকৃতিলাভ করে যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অতিশ্রেষ্ঠ মানুষেরও কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে আসতেন। তাঁরা ফিরে যেতেন এই দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে—যে-দেশকে ইনি স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছেন।

পাশ্চাত্যের একজন এঁকে কন্যা বলে গ্রহণ করেছিলেন।* তাঁর সাহায্যে এবং নিজ লেখা থেকে অর্জিত টাকায় ইনি নিজ সংসার ও বিদ্যালয় চালাতেন। তাঁর প্রতিবেশীরা জানতেন, তাঁর আয়ের বড় অংশ কিভাবে দুঃখীর প্রয়োজনে, ক্ষুধাতুরের ভোজনে ব্যয়িত হত। নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর জন্য তিনি উৎসর্গ করতেন।

তাঁর পৌরনীতিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র রূপে অচিরে তাঁর গলি এবং পার্শ্বস্থ অঞ্চল পরিচ্ছন্নতার একটি আদর্শ ছবি হয়ে দাঁড়াল। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি নিজ হাতে পথ পরিষ্কার করে পথ দেখালেন। এই সময়েই কলকাতায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাব ঘটে। তখন জনগণের ভীষণ আতঙ্কের কথা অনেকেরই মনে পড়বে। পাগলের মতো ট্রেন, স্টীমার বোঝাই করে পালিয়েছিল লোকে। ভীতির যখন চরম, ঠিক তখন মার্গারেট নোবল ত্রাণবাণী

নিবেদিতার কলকাতার বাড়িতে তাঁর ছবিতে ফুল দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এমপ্রেস পত্রিকায় নিবেদিতার লেখা 'লাইফ ইন দ্য নেটিভ কোয়ার্টার' রচনায় তাঁর কলকাতা আদি বাসস্থানে প্রথম দিকে ছাত্রী–সহ তাঁর ছবি।

নিয়ে এলেন। একদল তরুণকে সংঘবদ্ধ করে তাদের সাহায্যে তিনি শহরের উত্তর অঞ্চলের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর অংশগুলি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্লেগরোগীদের সেবার ভার নিলেন, যে-কাজে রোগীদের ছোঁয়াচ ছিল অপরিহার্য। একবার নীচুঘরের একটি শিশুরোগী মারা গেল তাঁর কোলে শুয়ে—সে তাঁকে নিজের মা মনে করে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ছিল সারাক্ষণ।

সন্তানকে ঘিরে রক্ষা করার এই মাতৃত্ব তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে—তিনি একবার নিজ ভৃত্যকে গায়ের গরম কাপড়টি দিয়ে দিলেন; ফলে যদিও তাঁকে শীতে কাঁপতে হয়েছিল, তবু ভেবেছিলেন, ঐ দরিদ্র মানুষটির প্রয়োজন তাঁর থেকে বেশী। অন্যের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করার এ তো মাত্র একটি দৃষ্টান্ত। চারিপাশের মানুষের অভাব ও দুঃখে তিনি কখনো অভ্যস্ত হতে পারেননি। আর তাই ছিল তাঁর নিত্য বেদনার কারণ।

প্রথমবার যখন ভারতে আসছেন, তখন একই জাহাজে আসছিল একটি ইংরেজ যুবক। ছেলেটিকে তার পিতামাতা বাড়িতে সামলানো অসাধ্য মনে করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেন। ছোকরা অসংযত-প্রকৃতি, খাওয়ার টেবিলে উৎপাত-বিশেষ। সকলেই তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, কিন্তু মার্গারেটের হৃদয় ভরে গেল গভীর করুণায়। বাড়ির শাসন আর প্রভাবের বাঁধন-কাটা ছেলেটির ভবিষ্যৎ কী ভয়ঙ্কর ! ছেলেটির সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে লাগলেন, তাকে তাঁর সঞ্চয়ের মধ্যে সবচেয়ে দামী জিনিসটি, একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন। ঐ ঘড়িটি জন্মদিনে মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মার্গারেট ছেলেটিকে বলেছিলেন, সে যেন কদাপি ঘড়িটি হাতছাড়া না করে—নিজ জীবনকে নিজে নির্মাণ করতে সে সমর্থ—তার উপরে একজনের এই বিশ্বাসের স্মারকরূপে যেন সে উপহারটিকে রক্ষা করে। গত বছর ছেলেটির মায়ের কাছ থেকে একটি মর্মস্পর্শী পত্র এসেছে। নিবেদিতার মধ্য দিয়ে তাঁর পুত্র কিভাবে নবজীবনের পথ খুঁজে পেয়েছিল, ঐ পত্রে সেকথা তিনি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন ; দক্ষিণ আফ্রিকায় মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর পুত্র সেকথা স্মরণ করেছে,—মা লিখেছিলেন।

নিবেদিতার মাতৃহৃদয়ের ঐ সমুদয় রক্ষা-শক্তি এসে কেন্দ্রীভূত হল ভারতবর্ষে। যে কঠোরতা বরণ করতে হল, তা অবশ্য তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে দিল। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে রইলেন দীর্ঘদিন। আরোগ্যলাভের পরে ডাক্তারের বিশেষ সতর্কবাণী শুনলেন, কর্মবাহুল্য তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্বনাশা।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের সংবাদ যে এসে গেল! এ দেশের মানুষের কষ্ট, আর তিনি শান্ত নিশ্চিন্ত থাকবেন, সে কি হয়! তাঁকে যেতেই হবে। দিনের পর দিন বরিশালের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালেন বন্যাপ্লাবিত কর্দমাক্ত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে। যে-ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিলেন, তাকে পরবর্তীকালে বর্ণনা করেছেন 'পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ ও বন্যা' রচনায়। জলাভূমির উপর দিয়ে অবিরত ভ্রমণ, তদুপরি প্রচণ্ড পরিশ্রম ও মানসিক চাপ, ফলে বিশ্রী ধরনের ম্যালেরিয়া ধরল তাঁকে। দারুণ রোগযন্ত্রণা, তবু তাঁর মর্মযাতনার তুলনায় সে কত সামান্য! আবার কাজ শুরু করার মতো ক্ষমতা ফিরে পেতে দীর্ঘদিন লাগল। কিন্তু তিনি কোনদিনই এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর পাশ্চাত্ত্যের প্রিয় বন্ধুরা ও এখানের ডাক্তার বন্ধুরা শহরের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর কোনো স্থানে বাসাবদল করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করলেও ফল হয়নি, যে-স্থানটি তাঁকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছে তার প্রতি বিশ্বস্ত তাঁকে যে থাকতেই হবে ! 'এই গলিটি আমাকে দত্তক নিয়েছে, আমি একে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।' ছোট ছোট যে-সব বাচ্চাগুলোকে গলিতে টলমল করে চলতে দেখেছেন তারা তাঁকে ঘিরে বড় হয়ে উঠেছে—তারা তাঁর সন্তান। কতো ঝড়ো-প্রাণ তাঁর কাছে এসেছে, তিনি তাদের মহৎ করে তুলেছেন। তিনি বাছাই করে নেবেন ? সে হয় না। তিনি তুলে নেবেন, যা এসেছে।

প্রতিদিনের জীবনে যা দেখেছি, সেই বিশেষ নারীপ্রকৃতির দিক থেকেই তাঁর কথা আমি বলছি। পূর্ণ তপস্যা আর ন্যায়ৈষণা তাঁকে বেষ্টন করে থাকত পবিত্র অগ্নির মত, তাঁকে আলোকিত করত। অন্যেরা বিরাট নৈতিক ও মানসিক শক্তিরূপে তাঁকে জানবে। এ দেশের পরম প্রয়োজনের ক্ষণে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, ঐ শক্তির ঐশ্বর্য নিয়ে। তাঁর মত সম্পূর্ণ আত্মবিলয় আমি কোথাও

দেখিনি। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, বা পণ্ডিত-কুলের অনেককেই আমি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ মনীষা, মহান্ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশংসায় শ্রদ্ধায় পূর্ণ হতে দেখেছি।* (বিশেষত জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে নিবেদিতার যোগ থাকায়, এবং নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করায়, স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক মহলের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ ঘটেছিল। নিবেদিতা অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক মহলে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার স্বীকৃতির জন্য বহু লড়াই করেন। এখানে একথাও বলতে হবে, জগদীশচন্দ্রের চিন্তা ও আবিষ্কারগুলিকে নিবেদিতা যে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন, তা তিনি করতেই পারতেন না, যদি না স্বয়ং তীক্ষ্ণ বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হতেন। লর্ড কেলভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে, যাঁরা জগদীশচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে নিশ্চয় নিবেদিতারও। নিবেদিতা বোসপাড়া লেন নামক বাগবাজারের একটি সংকীর্ণ গলিকে বাসস্থান করলেও বিশ্বচরিত্র।) যেসকল বিরল গুণরাশি পাশ্চাত্ত্য দেশে বিরাট ভবিষ্যতের পথ খুলে দেয়, সে সকলই তাঁর ছিল, আর সমস্তই তিনি অর্পণ করেছিলেন আমাদের মাতৃভূমির সেবায়। তিনি ইংলন্ডকে কম ভালবাসতেন, তা নয়, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ন্যায়ের মধ্য দিয়েই ইংলন্ডকে বড়ো থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে তিনি নিজেকে এমনভাবে একাত্ম করে দিতে পেরেছিলেন, যাতে আমি তাঁকে কখনো বলতে শুনিনি "ভারতের প্রয়োজন", "ভারতীয় নারী"—সব সময়ে তা "আমাদের প্রয়োজন", "আমাদের নারী"। বাইরে থেকে তিনি সাহায্য করতে আসেননি, কদাপি নয়, তিনি আমাদেরই একজন, আমাদের মুক্তির জন্য ব্যাকুল বেদনায় সন্ধান ও সংগ্রাম করে ফিরেছেন।

আর অল্পই বলবার আছে। ভারত সম্বন্ধে দুটি বৃহৎ গ্রন্থরচনার ভার তাঁর উপর দিয়েছিল লন্ডন ও নিউইয়র্কের দুই প্রধান প্রকাশক। সেই কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এর সঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ের শ্রমসাধ্য কাজও করে চলছিলেন। ফলে স্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটল। মনে হল দার্জিলিংয়ের সুন্দর আবহাওয়ায় হয়ত তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধার হতে পারে।

অনেক বছর আগে একদিন বিদেশে রোগশয্যায় তিনি আমার শুশ্রূষা করেছিলেন, আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। এবার সুযোগ আমার। আমরা আশা হারাই নি, কিন্তু তিনি জানতেন, নিয়তি অন্য কথা লিখেছে। তাই বলে কোনো বিষাদ নয়। প্রতি প্রভাতে উজ্জ্বল হাসি আর দীপ্ত কথায় আমাদের অভ্যর্থনা করতেন। তাঁর জীবনের প্রিয় কাজের কথাই শুধু বলতেন—"আমাদের মেয়েদের" শিক্ষা—সে শিক্ষা কি করে চালাতে হবে, সেই কথা। তাঁর যা-কিছু সম্বল, বই থেকে ভবিষ্যতে যা-কিছু আয় হবে, সবই তিনি উইল করে দিলেন মাতৃভূমির সেবায়।

সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গিয়েও এই শেষের দিনগুলিতে তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর আত্মবিলয় সম্পূর্ণ হয়নি। কে-যেন তাঁকে একবার তাঁর প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কথা বলেছিল ! সেই কথাটি নিশ্চয় তাঁর মনে ফিরে এসেছিল। তিনি প্রার্থনা করলেন, এবার তিনি যেন চলে যেতে পারেন, যাতে অন্যরা বেড়ে উঠতে পারে। *১

দার্জিলিঙয়ে আসার কয়েকদিন আগে তিনি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রার্থনামন্ত্র ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন বন্ধুদের কাছে পাঠাবার জন্য।*২ সেটি বিশ্বের জন্য মানুষের প্রতিদিনের প্রার্থনা। তিনি বোধহয় জানতেন, এই তাঁর বিদায়বাণী। বিশ্বমুক্তির জন্য নিরন্তর প্রার্থনার তুল্য তাঁর যে-জীবন—এই বৌদ্ধ প্রার্থনায় তারই ধ্বনি। প্রার্থনাটি তিনি আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন :

শত্রুহীন, বাধাহীন, দুঃখজয়ী, আনন্দপ্রাপ্ত যাহা কিছু আছে, সে সকলের শ্বাস প্রবাহিত হউক, তাহারা নিজ নিজ পথে মুক্তগতিতে অগ্রসর হউক। পূর্বে এবং পশ্চিমে, উত্তরে এবং দক্ষিণে যাহা কিছু আছে, যাহা শত্রুহীন, বাধাহীন, দুঃখজয়ী, আনন্দপ্রাপ্ত, তাহাই নিজ নিজ পথে মুক্তগতিতে অগ্রসর হউক।

তাঁর কাছে অজ্ঞানই চরম বন্ধন। তাঁর আনন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত যখন তিনি আবৃত্তি করতেন :

অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও ; অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও ; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও ; আমার অন্তরের অন্তরে তুমি প্রবেশ কর। হে রুদ্র, তোমার কল্যাণ-মধুর মুখদ্বারা তুমি আমাদের নিরন্তর রক্ষা করো !

মেঘে কুয়াশায় পূর্ণ দিনগুলি। কিন্তু ১৩ই অক্টোবরে প্রভাতে কিছু কালের জন্য মেঘ সরে গেল। যে-তরী ডুবছে, তার কথা তিনি বললেন, কিন্তু সূর্যোদয়ও দেখবেন, সে কথাও। তুষারের উপর সদ্য সূর্যোদয় হয়েছে, তারই একটা আলোকরেখা যখন বিচ্ছুরিত হয়ে প্রবেশ করেছে কক্ষে, তখনই সেই বিরাট সংগ্রামী আত্মা চলে গেল, অন্য ঊষার দ্বারে।

তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে আছি আমি, হৈমবতী উমার যে-কাহিনী বলতেন, তা চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। এই তো সেই ঋতু, যখন তিনি পিতৃগৃহে আসেন। আমার সামনেও আর এক উমা, তুষারশুভ্র তুষারকন্যা, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে ফিরে এসেছেন আবার তাঁর ভারতের ভবনে। তাঁর স্বজন, স্বগৃহকে জানবার জন্য কি তাঁর এই আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল ! নাকি আমাদের পিতার গৃহে উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম বলে কোনো কথা নেই !

নিবেদিতা সম্পর্কে ভাই রিচমন্ডের স্মৃতিচারণ

নিবেদিতার জীবনীকার রেম-হারবার্টকে পাঠানো নিবেদিতার ভাই রিচমন্ড নোবেলের স্মৃতিচারণের নির্বাচিত অংশ পুর্নমুদ্রিত হলো।

সাহিত্য ও শিক্ষা মার্গারেটের কাছে জোরালো আকর্ষণের বস্তু হলেও তাই তার স্থায়ী আকর্ষণের বিষয় নয়। ধর্মই নিঃসন্দেহে তার মূল জীবনোদ্দেশ্য। ধর্ম সে পেয়েছিল উত্তরাধিকাররূপে।

পরিবারের অন্যান্যদের মতই মার্গারেটের আদি ধর্মীয় শিক্ষা ইভেনজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্ট মত। এ বিষয়ে কোনো ভুল ধারণা যেন না থাকে। অধিকাংশ লোকের ধারণা, সকল ইভেনজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্টই ক্যালভিনিস্ট। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমরা Free Will-এ বিশ্বাস করি, এবং আমাদের কোনো Predestination তত্ত্বে বিশ্বাস করতে নির্দেশ দেওয়া হয় না কিংবা বিশেষভাবে কাউকে ত্রাণ করতে, নরকে পাঠাতে বা চির শাস্তির বিধান দিতেও বলা হয় না। জন ওয়েসলি এবং সিমিয়ন-এর আদর্শে আমরা ইভেনজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্ট। অন্য পক্ষে ক্যালভিনিস্টদের চেয়ে আমাদের কর্মভার কিছু কম নয়। আমরা কঠোরভাবে 'স্যাবাথ' পালন করি, প্রতি রবিবারে দুই থেকে চারবার পর্যন্ত পূজানুষ্ঠানে যোগ দিই, বাইবেলকে মানবের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রেরণাবাণীরূপে গণ্য করবার মত শিক্ষা আমরা পাই; বাইবেলের মধ্যে আমাদের জীবনাচরণের সম্পূর্ণ নীতিনির্দেশ করা আছে, যে আচরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রত্যক্ষ ও পূর্ণভাবে আমরা দায়বদ্ধ। একথা সত্য, ক্যালভিনিস্টদের মত কোনো ক্লান্তিকর বাঁধা বুলির কাছে নতিস্বীকার করতে আমাদের বলা হয় না, কিন্তু আমরা অপরপক্ষে বিশ্বাস করি, একদিন আমাদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠে ঈশ্বরের কাছে অপরাধীরূপে আমাদের উপস্থিত করবে। এ ধরনের শিক্ষা সমুচ্চ অখণ্ড বিশ্বস্ততা দাবি করে, যা মোটেই মনোরম ব্যাপার নয়। এড়িয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া, বা ছলচাতুরীর কোনো সুযোগ এখানে নেই, আমাদের সমস্যার মুখোমুখি আমাদেরই হতে হয়,—সবকিছু দায়িত্বও আমাদেরই, অন্য কারো নয়। এই শিক্ষার সুগভীর প্রভাব আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যেই ছিল, এবং মার্গারেটের জীবনের সকল পর্যায় এই নীতির উপর গঠিত হয়েছিল।

উৎসাহী ইভেনজেলিক্যাল মতাবলম্বীর ধর্মোৎসাহপূর্ণ হৃদয় সহজেই নূতন প্রভাবে ধরা দেয়। বিদ্যালয় ত্যাগ করবার আগেই মার্গারেট চার্চ অব ইংল্যান্ডের 'হাই চার্চ' বা 'ট্রাকটারিয়ান' আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে।

এই আন্দোলনকে চার্চ অব ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে রোমান ক্যাথলিকতার অনুকরণপ্রয়াস বলা হয়ত অনুচিত হবে, যদিও এই আন্দোলনের অনেক অনুগামীই রোমান ক্যাথলিক মতের তৃতীয় শ্রেণীর অনুকারী ছাড়া কিছু নয়।

ইভেনজেলিক্যালরা পূজাপদ্ধতির বিষয়ে অল্পই

মনোযোগ দেয়; 'স্যাক্রামেন্ট' প্রভৃতিতে গুরুত্ব আরোপ করে সামান্যই; ঐ সবের মূল্য বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রভুর স্মরণ-মনন ঘটানোতেই মাত্র। গির্জার পাদরীরা ঐতিহাসিকভাবে অ্যাপসল্‌দের কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন কি না এ বিষয়ে ইভেনজেলিক্যালরা ভ্রূক্ষেপই করে না। অপরপক্ষে ট্রাকটারিয়ানরা প্রকাশ্য পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে মনোযোগী, স্যাক্রামেন্টার শুভফলের উপর জোর দেয়, এবং ঐতিহ্যধারাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে। অর্চনার আনুষ্ঠানিকতাকে তারা বর্ধিত করেছে, রোমান চার্চের সঙ্গে সচরাচর যুক্ত এমন বহু আনুষঙ্গিক জিনিসের প্রবর্তন করেছে। এই সকল ক্ষেত্রে তারা অনেকাংশে শিল্পসুষমা পেয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে এমনকি রোমীয় নমুনাকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছে। সর্বজনীন পূজাপাঠে, তাদের অনবদ্য গদ্য রচনা এবং উপাসনার অপূর্ব শিল্পরূপ এখানে তাদের সহায়তা করেছে।

এই বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এই দেখাতে যে, আমার বোনের রোমান্টিক স্বভাবের সঙ্গে কোন্ বস্তুর সংযোগ ঘটেছিল, এবং কী তাকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। এর ফলে ধর্মার্চনায় কেবল বর্ণগরিমা ও নাটকীয়তাই সে লাভ করেনি, (তার মন সর্বদা শিল্পের ভাব্যকৃতিতে পূর্ণ থাকত)—তার মন যুক্ত হতে পেরেছিল অতীত সন্তগণের যুগের সঙ্গে। মার্গারেট ভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক সময়ে রোমান চার্চে যোগদানের কথাও ভেবেছিল। যদি এমন ঘটনা ঘটত, তাহলে হয়তো কোনো সিস্টার নিবেদিতাকে পাওয়া যেত না। মার্গারেট যদিও ভক্তিমতী কিন্তু তাকে কোনোভাবে অনড় অন্ধভক্ত বলা যাবে না। এক গুডফ্রাইডেতে—যে-দিনটিতে নিষ্ঠাবান হাই চার্চ ব্যক্তিদের উপাসনা ও ধ্যানাদিতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করার কথা—সে পরমানন্দে মজা করে তার ছোট্ট ভাইয়ের সঙ্গে তাস খেলতে বসেছিল। এহেন স্বাধীনতা গ্রহণের ব্যাপারটা তার ভাই ভুললেও সে কখনো ভোলেনি। তার জীবনের শেষের দিকে ভাই যখন ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিল, সে ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য নিজের এই রীতি পরিহারের ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়েছিল।

অন্য প্রভাবের সম্মুখীন হওয়াও তার নির্ধারিত নিয়তি। অ্যাংলো-ক্যাথলিক-দের (এ নামই তারা সাধারণতঃ পছন্দ করে) সংকীর্ণতার প্রতিরোধ না করে সে পারেনি; অ্যাংলো-ক্যাথলিক মত তাকে তার মনোবিকাশের সুযোগ দেয়নি। তা আবেগকে পুষ্ট করলেও বুদ্ধিকে শুকিয়ে মারত। সে কিভাবে চার্চ অব ইংল্যান্ডের উদারতা চিন্তাশীলদের সংস্পর্শে এসেছিল তা বলতে পারব না, কারণ আমরা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখতে পারিনি। মনে হয় সে যাজক স্কট হল্যান্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং তাঁর মারফৎ ফ্রেডারিক ডেনসন মরিস ও তাঁর মত অন্যান্যদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। সে যাই হোক, সে "উদারনৈতিক ধর্মীয় চিন্তার" মূল্য স্বীকার করতে শুরু করেছিল।

এই উদার চিন্তার জগতে যখন সে প্রবেশ করেছে, তখন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ; তার ফলেই প্রাচীন ধর্মগুলির উদারনৈতিকতার রূপ সে প্রথম উপলব্ধি করল; 'আমার ধর্মেই একমাত্র ত্রাণ সম্ভবপর'—এই যে ধারণা ইহুদী, খ্রীস্টান কিংবা ইসলাম প্রভৃতি সেমিটিক ধর্মগুলি পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে পোষণ করেছে ঐ প্রাচীন ধর্মগুলি সেই ধারণা থেকে একেবারে মুক্ত। একথা হয়ত বলা চলে, ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে এই সংযোগ তাকে খ্রিস্টীয় ধর্মমতকে নূতন দৃষ্টিতে দর্শনের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, একথা ঠিক, একেবারে প্রথম থেকেই সে অনুভব করেছিল ভারতের ডাক আছে তার জন্য।

মার্গারেট প্রথমবার ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করার আগে স্বামীজীকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। স্বামীজীকে মানবদেহে যিনি দেখেছেন তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব তিনি কি ছিলেন। শিষ্যরা সচরাচর গুরুর মধ্য থেকে নিজেদের অভিপ্রেত শিক্ষা-বস্তুকেই নির্বাচন করে নেয়, এবং তারা গুরুকে নিজেদের মতাদর্শের প্রয়োজনেই ব্যবহার করে। কিন্তু স্বামীজীকে জানার অর্থ স্বয়ং খ্রীস্ট কী ছিলেন তাই কিছুটা জানা। অফুরন্ত রসিকতার ভাণ্ডার ছিলেন; সেই হাসির আলোকেই নানা যুগের বিচার করতেন, এবং সেইভাবেই অনুভব করিয়ে দিতেন, ঈশ্বর আমাদের স্নেহশীল পিতা-মাতা, কদাপি নির্দয়-কঠোর প্রভু নন। নির্লিপ্ত বোধের এক জগতে তিনি উন্নীত করে দিতেন।

স্বামীজীর সাক্ষাৎ যে পেয়েছে, কোনো না কোনোভাবে উন্নীত না হয়ে সে পারবে না। মানুষটা হয়ত মন্দ লোকই রয়ে গেল, কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে সে এইটুকু সান্ত্বনা অন্ততঃ পাবে, সে আরও কত মন্দ হতে পারত কিন্তু হয়নি। স্বামীজীর সংস্পর্শ কোনো না কোনো ভাবে মন্দত্বের সংশোধন না করে পারে না।

মার্গারেটের প্রথম ভারতযাত্রার দিনটিকে এখনো আমার মনে পড়ে—ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া লাইনারে সে যাবে—আমরা বিদায় দিতে গিয়েছি টিলবেরী ডকে। আমার অন্য বোন এবং মাও ছিলেন। আরও দুজন বন্ধু ছিলেন—এবেনিজার কুক, যিনি মরিসের বন্ধু ও ড্রয়িং-শিক্ষক এবং অক্টেভিয়াস বীটি, যিনি ১৮৯৫ সালে চেলসিয়া থেকে উদারনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছিলেন। মা এবং বোন কাঁদতে লাগল। জাহাজের যাত্রীদের এবং নেপলস্ প্রভৃতি যেসব বন্দরে জাহাজ ছুঁয়েছিল তাদের জীবন্ত বর্ণনায় পূর্ণ মার্গারেটের চিঠিগুলির কথা আমার এখনো মনে আছে।

নিবেদিতা সম্পর্কে ভাই রিচমন্ডের লেখা

নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর ভাই খ্রিস্টিয় যাজক রিচমন্ড নোবেল 'অনুজের শ্রদ্ধা' শীর্ষক নিবন্ধে ১৯১২-র জানুয়ারিতে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় মিস মার্গারেটের (পরবর্তীকালের নিবেদিতার প্রথম জীবনের) খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাসের ক্রম-রূপান্তরের কথা লিখেছেন। ভাই রিচমন্ড-এর লেখায় দিদি মার্গারেট-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোকিত হয়েছে। তারই নিবার্চিত অংশ প্রকাশিত হল।

আমার ভগিনীর ভারত গমনের পিছনে কোন্ কারণ-সমবায় বর্তমান ছিল, সে বিষয়ে অল্প কিছু বলি। শ্রীমতী অবলা বসু তাঁর প্রবন্ধে অনুগ্রহ করে আমার পিতার এক বিচিত্র পূর্ব ধারণা বিষয়ে জানিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে মার্গট (এই নামেই আমার বোনকে আমি সর্বদা স্মরণ করি) যে ডাকে সাড়া দেবে, তার প্রারম্ভিক অনুশীলন কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। পনের বছরের মত যখন তার বয়স, তখন চার্চ অব ইংল্যান্ডের ট্রাকটারিয়ান আন্দোলন তার মনে নাড়া দেয়। এই আন্দোলনে পূজা-প্রার্থনায় যে বর্ণ-মহিমা এবং স্যাক্রামেন্ট প্রভৃতি প্রতীকের উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল, অনুগামীদের কাছ থেকে যে নিষ্ঠাভক্তি ও শারীরিক কৃচ্ছসাধনা দাবি করা হয়েছিল,—তা আমার ভগিনীর কল্পনাকে আকর্ষণ করে এবং তার জীবনে প্রথম বড় ধরনের ধর্মীয় প্রভাব হয়ে দাঁড়ায়। এই 'হাই অ্যাংলিসিজমে'র প্রভাব তার জীবনে শেষ সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। এই কালের আত্মনিগ্রহের অভ্যাস পরবর্তীকালে তার কর্মজীবনের পক্ষে তাকে অধিকতর যোগ্য করে তুলেছিল।

হাই অ্যাংলিসিজম্ ছিল অতীব কঠোর, অনমনীয়, নিতান্ত অনুদার,—তা মার্গটের মত চরিত্রের আধ্যাত্মিক আকুতি শান্ত করতে পারেই না, কারণ নিশ্ছিদ্র গোঁড়ামি, অন্য মতাবলম্বীদের সম্বন্ধে এর অনুগামীদের প্রকাশ্য অসহিষ্ণুতা মার্গটকে অবশেষে নূতনতর পথের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করল—এই ধর্মরীতি ছাড়া অধিকতর 'খ্রীস্টীয়', অধিকতর মানবিক কোনো ধর্ম আছে কি? ট্রাকটারিয়ানরা অবশ্য তাকে ঐতিহ্যের মূল্য শিখিয়েছিল। ক্রমে সে চার্চ অব ইংল্যান্ডের 'দি ব্রড চার্চ স্কুল' নামে পরিচিত সংস্থায় যোগ দিল, কিন্তু তার প্রথম জীবনের ট্রাকটারিয়ান-অভিজ্ঞতার অনেকখানি তার মধ্যে থেকে গেল।

উৎকৃষ্টতর শব্দের অভাবে Broad churchism যাকে বলছি, সে বস্তু মার্গটের মতো চরিত্রের মানুষের আধ্যাত্মিক আকুতি শান্ত করতে পারেই না, কারণ মামুলী কতকগুলি কথা বলা ছাড়া এর মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি অথবা সুগভীর কোনো শিক্ষা ছিল না। এর মধ্যে ছিল এক ধরনের সিনিক মনোভাব যা অন্যের বিশ্বাসকে কুসংস্কারপূর্ণ বা বিদ্যাহীন মনে করত, সেই জন্য ধর্মজীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় রসানুভূতির প্রশ্রয় এতে ছিল না। মার্গটের জীবনের এই সন্ধিক্ষণেই স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। সে এতাবৎ যা শিখে বা অনুভব করে এসেছে, সব কিছুকেই স্বামীজীর শিক্ষার মধ্যে সমন্বিত দেখতে পেল, সব কিছুই এক সমগ্রের অংশ, কোনো কিছুই অপরকে খণ্ডন করে না; সবই এখন নূতন জীবনে, নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে গেল, এবং মার্গটের সদা-প্রস্তুত সহানুভূতি অধীনস্থ এক জাতির যাতনার অনুভবে সহজেই জাগরিত হয়ে উঠল।

স্বামীজী দেহত্যাগ করেন তরুণ বয়সেই। আমার ভগিনীও দেহত্যাগ করল অল্প কিছু বেশী বয়সে। আমার ভগিনী যে স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, তা অদ্ভুত কিছু নয় কারণ আমি নিজে স্বামীজীকে দেখেছি, আমি জানি তাঁর শক্তি। তাঁকে একবার শুধু দেখা ও তাঁর কথা শোনা মাত্র অবিলম্বে বলতে হবে আত্মগতভাবে—Behold the Man! —দেখ, দেখ, কে ইনি ! সত্য ধ্বনিত তাঁর কণ্ঠে—মানুষ অনুভব করত—কারণ তিনি অধিকারের সঙ্গে কথা বলতেন, শুধু পণ্ডিত বা, পুরোহিতের মতো করে নয়। স্বামীজী নিশ্চয়তাকে, প্রত্যয়কে নিজের মধ্যে বহন করতেন, জিজ্ঞাসুকে দিতেন আশ্বাস ও বিশ্বাস। সেই জিনিসই আমার ভগিনীকে তিনি দিয়েছিলেন; এই ধ্রুব-প্রত্যয়ই তাকে স্বামীজীর আহ্বানে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে শক্তি দিয়েছিল; এবং বিনা দ্বিধায় সে আহ্বান স্বীকার করার পরে কখনো তাকে অনুতাপ করতে হয়নি।

প্রিয়জনের বিয়োগবেদনা আরও বেড়ে যায় যদি স্বভূমি থেকে বহু দূরে তার মৃত্যু ঘটে। আমার ভগিনীর ক্ষেত্রে কিন্তু মনে হয়েছে, সে যেন শেষ ক্ষণে আমাদের মধ্যে আয়ারল্যান্ডেই ছিল। ডাঃ বসু এবং শ্রীমতী বসুর আবাসে তার জীবনাবসান, তা যেন তার স্বজনের মধ্যে, পরিবারের মধ্যেই। মার্গারেটের প্রতি আমি এই কৃতজ্ঞতা বোধ করেছি, সে তার জাতির ঐতিহ্যগত কর্তব্য পালন করে গেছে শেষ অবধি—সে সাহায্য করছে মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মানুষকে, এবং শান্তির পথে চালিত করেছে তাদের অভিযাত্রাকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির হাতে ডি লিট প্রাপ্তির সংশাপত্র তুলে দিচ্ছেন।

২৬ জানুয়ারি, ২০১৯। রেড রোড।